বিজ্ঞানের খবর

বিজ্ঞানের খবর

অধ্যাপক

শ্রীসুশীলচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম্, এস্-সি

প্রণীত

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

সন ১৩৪০ সাল

প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

মূল্য বার আনা

প্রিণ্টার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীপতি প্রেস
৩৮, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

* উৎসর্গ *

পরম পূজনীয়

পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ

মহারাজের

শ্রীশ্রীপাদপদ্মে—

সূচী

বিজ্ঞানের খবর

মজার জায়গা

ঘরের মেঝের উপর একখানি বই পড়িয়া আছে। উহাকে উঠাইয়া টেবিলের উপর রাখিতে গেলে তোমার কি মনে হয় বল ত? তোমার মনে হয় না কি যে বইখানি যেন মেঝের উপরেই থাকিতে চাহিতেছে? তাহাকে যখনই উপরে তুলিতে যাইবে সে তখনই কেবল নীচের দিকে যাইতে চাহিবে। সে যদি তোমার মত কথা বলিতে পারিত তবে হয়ত বলিত যে "আমি নীচেই থাকিব"। তুমি যখন তাহাকে টেবিলের উপর উঠাইবে তখন যেন তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে জোর করিয়া উঠাইতে

হইবে। আবার বইএর বদলে যদি একখানি ইট ঘরের মেঝে হইতে উপরে উঠাইয়া রাখিতে যাও তাহাও ঠিক একইরূপ ব্যবহার করিবে—বরং এবার তোমাকে আরও বেশী জোর দিতে হইবে। শুধু ইট বা বই কেন, যে কোন জিনিষকে—এমন কি এক টুক্‌রা কাগজকেও—নীচে হইতে উপরে উঠাইতে গেলে জোর করিয়া উঠাইতে হয়। ইহার কারণ কি বলত ?

আবার দেখ, বইখানি যখন টেবিলের উপর থাকিবে তখন যদি উহাকে সরাইয়া ঠেলিয়া উপর হইতে ফেলিয়া দাও, তবে তখনই উহা নীচে পড়িয়া যাইবে। ঘরের মধ্যে খোকার যে দোল্‌না ঝুলিতেছে, যদি উহার দড়িগুলি কাটিয়া দাও তবে দোল্‌নাটি ধপ্‌ করিয়া ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া যাইবে। ছাদের উপর ঘুঁড়ি উড়াইবার সময় যদি খেয়াল না রাখিয়া ছাদের কিনারার বাহিরে আসিয়া যাও তবে কি বিপদ হয়, তাহাত বুঝিতেই পার। আবার ইহাও দেখিয়াছ যে গাছের আমটি পাকিলে উহা টুপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। ফুট্‌বলকে কিক্‌ করিয়া খুব উপরে পাঠাইয়া দিলেও সে আবার নীচের দিকে আসে এবং অবশেষে মাটিতে পড়ে। এই সব দেখিয়া মনে হয় কে যেন উহাদিগকে অদৃশ্য দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দিয়া সর্ব্বদাই নীচের দিকে টানিতেছে। এই সব ব্যাপারের কারণ কি বলত ? বই, ইট ইত্যাদি উপরে তুলিতে গেলে জোর লাগে কেন ?

আবার দোল্‌না, পাকা আম বা ফুট্‌বল সব নীচের দিকে পড়ে কেন? উপরে কেন উঠিয়া যায় না? তুমি হয়ত বলিবে যে উহারা ভারী বলিয়া—অর্থাৎ উহাদের 'ওজন' আছে বলিয়া—উহারা নীচের দিকে পড়ে।

আচ্ছা, ওজন থাকিলেই উপরে উঠিবে না, নীচের দিকেই পড়িতে হইবে, ইহা কেন? অর্থাৎ ওজনের প্রকৃত অর্থ কি তাহা কি কখনও ভাবিয়াছ? বোধ হয় না। এ বিষয়ে প্রথমে কে ভাবিয়াছিলেন জান কি? প্রথমে ভাবিয়াছিলেন ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যর আইজাক্‌ নিউটন*। একদিন বাগানে বসিয়া একটি আপেল ফলকে গাছ হইতে নীচে পড়িতে দেখিয়া তিনি এই বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করেন। পূর্ণ ষোল বৎসর চিন্তা ও নানা পরীক্ষার পর অবশেষে ১৬৮২ সালে তিনি ইহার কারণ বাহির করেন। তিনি বলিয়াছেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তুকে সর্ব্বদাই টানাটানি করিতেছে। তিনি এই টানাটানি বা আকর্ষণের নাম দিলেন **মাধ্যাকর্ষণ**। ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে এই টানাটানির বিরাম নাই, সূর্য্য পৃথিবীকে টানিতেছে এবং পৃথিবী সূর্য্যকে টানিতেছে, পৃথিবী চন্দ্রকে টানিতেছে এবং চন্দ্রও পৃথিবীকে টানিতেছে। আবার পৃথিবী, ইট, কাঠ, বই, গাছের ফল, ফুট্‌বল, তোমাকে, আমাকে সকলকেই নিজের দিকে টানিতেছে। পৃথিবীর এই টান

* লেখক প্রণীত "বিজ্ঞান কাহিনী"তে নিউটনের বিষয় পাঠ কর।

যদি না থাকিত তবে ফুট্‌বলকে একবার কিক্ করিয়া উপরে পাঠাইয়া দিলে উহা আর নীচে নামিত না, আর আম পাকিয়া বোঁটা হইতে খসিয়া গেলেও নীচে পড়িত না। তোমরা বলিতে পার, "পৃথিবী যেমন এই আম বা ফুট্‌বলকে নীচের দিকে টানিতেছে উহারাও ত সেইরূপ পৃথিবীকে উপরের দিকে টানিতেছে ; তবে উহারাই কেবল পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়ে কেন ? পৃথিবী ত একটুও উপরের দিকে যায় না।" ইহার কারণ—একটা জিনিষ আর একটি অপেক্ষা যত বড় তাহার টানিবার জোরও তত বেশী। ইট, বই, ফুট্‌বল অথবা তুমি, আমি ইত্যাদি সকলের চেয়ে পৃথিবী যে কত বড় তাহার তুলনাই হয় না ; সুতরাং ইট, বই ইত্যাদি সকল জিনিষের উপর পৃথিবীর টানের তুলনায় পৃথিবীর উপর ইহাদের টান নাই বলিলে কিছুই ভুল হয় না। সেজন্য এই সব জিনিষকেই শুধু নড়িতে দেখা যায়, অর্থাৎ মোটের উপর দেখা যায় যে পৃথিবীই সব জিনিষকে নিজের গর্ভের দিকে টানিতেছে। উপরের দিকে লাফাইলে এই টানের জোরেই আবার আমরা পৃথিবীর পিঠের উপর আসিয়া পড়ি। এই টানকেই আমরা '*ওজন*' বলি। পৃথিবী যাহাকে যত বেশী জোরে টানে তাহার ওজন তত বেশী। যখনই কোন জিনিষকে পৃথিবীর উপর হইতে উঠাইতে যাই তখনই এই টানের অস্তিত্ব বোধ করি। বইখানি অপেক্ষা ইটখানির উপর টান

বেশী বলিয়া ইটখানি উপরে উঠাইতে বেশী জোর লাগে এবং আমরা বলি যে ইটখানির 'ওজন' বেশী।

দু'টি বস্তুর ভিতর এই যে টানাটানি ইহার সম্বন্ধে আর একটি কথা এখনও বাকি আছে। উভয়ের মধ্যে দূরত্ব যত অধিক হইবে উহাদের পরস্পরের আকর্ষণের শক্তি বা টানা-টানির জোর তত কমিয়া যাইবে। সুতরাং পৃথিবী হইতে কোন জিনিষকে যত দূরে লওয়া যাইবে তাহার উপর পৃথিবীর টানও তত কমিতে থাকিবে। এই দূরত্ব মাপা হয় পৃথিবীর ঠিক মাঝখান. অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে। আমরা পৃথিবীর পিঠের উপর বাস করি। এই পিঠের উপর হইতে কোন জিনিষকে যদি একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায় লইয়া যাওয়া যায় তবে পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে ঐ জিনিষটির দূরত্ব বাড়িয়া গেল বলিয়া সেখানে উহার উপর পৃথিবীর টানের জোর কমিয়া যাইবে অর্থাৎ উহার ওজন একটু কমিয়া যাইবে। একটি পাঁচসের ওজনের জিনিষকে পৃথিবী হইতে যদি পঞ্চাশ হাজার মাইল উপরে লওয়া যায় তবে সেখানে উহার ওজন মাত্র আধ ছটাক হইবে। কলিকাতায় একটি জিনিষের ওজন যত হইবে দার্জ্জিলিংয়ে সেই একই জিনিষের ওজন একটু কম হইবে, কারণ দার্জ্জিলিং কলিকাতা হইতে প্রায় ৭৫০০ ফুট উঁচু।

ভূগোলে তোমরা নিশ্চয়ই পড়িয়াছ যে পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। অর্থাৎ ইহার কেন্দ্র হইতে পিঠের উপরের

দূরত্ব সব জায়গায় সমান নয়—উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দূরত্ব সব চেয়ে কম। এই কারণে সকল জিনিষের উপর পৃথিবীর টানের জোর সব জায়গায় সমান নয়। সুতরাং যদি একই জিনিষকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় লইয়া যাও তবে দেখিবে যে উহার ওজন কোথাও কম কোথাও বেশী হয়। একই জিনিষ ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আনিলে তাহার ওজন একটু কমিয়া যাইবে, আবার ইংলণ্ড হইতে গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে লইলে একটু বাড়িবে, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে লইলে ওজন সব চেয়ে বেশী হইবে, কারণ ঐ দুই জায়গার দূরত্ব অন্য সব জায়গার দূরত্ব অপেক্ষা কম। কিরূপ মজার কথা ভাবিয়া দেখ দেখি। জিনিষটি যেমন তেমনি থাকিল অথচ এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় লইলে উহার ওজন বদ্‌লাইয়া গেল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ওজনটা কোন জিনিষের স্থায়ী সম্পদ নয়; ইহা কম বেশী হয়। জিনিষটি পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে কত দূরে আছে তাহার উপরই উহার ওজন সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

আবার দেখ, যদি আমরা মাটির ভিতর গর্ত্ত করিয়া ক্রমশঃ পৃথিবীর গর্ভের ভিতর যাইতে থাকি তাহা হইলেও আমাদের ওজন কমিতে থাকিবে, কারণ দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর পিঠের উপরেই উহার টানের জোর সব চেয়ে বেশী। এখান হইতে উপরের দিকে গেলে টান কমিতে থাকে এবং ভিতরেও ক্রমশঃ টান কমিতে থাকে। যদি

গর্ত্ত করিয়া ক্রমশঃ পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছান যায় তবে সেখানে যে দূরত্বের জন্য পৃথিবীর টান কম বেশী হয় সে দূরত্ব একেবারেই থাকিবে না, স্থতরাং সেখানে পৃথিবীর কোন টানই থাকিবে না—অর্থাৎ সেখানে কোন জিনিষের কিছুই ওজন থাকিবে না। আর একটি এইরূপ মজার জায়গার খবর দিব। সেখানেও কোন জিনিষের ওজন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তুমি পৃথিবীর যতই উপরে উঠিবে ততই তোমার ওজন কমিয়া যাইবে। এইরূপে তুমি যদি ক্রমশঃ সূর্য্যের কাছাকাছি যাও তবে সেখানে সূর্য্য তোমাকে পৃথিবী অপেক্ষা অনেক জোরে টানিতে থাকিবে, স্থতরাং সেখানে হাত পা ছাড়িয়া দিলে তুমি পৃথিবীর উপর পড়ার বদলে সূর্য্যের দিকে যাইতে থাকিবে। যদি সূর্য্যের কাছাকাছি না গিয়া পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে এমন জায়গায় যাও যেখানে পৃথিবী ও সূর্য্য উভয়ের টানের জোর সমান—অর্থাৎ সূর্য্য যত জোরে তোমাকে টানিবে পৃথিবীও অন্য দিকে সমান জোরে টানিতে থাকিবে—তবে সেই জায়গায় তোমার বা অন্য কোন জিনিষের কোনই ওজন থাকিবে না। সেখানে সকল জিনিষই ভাসিতে থাকিবে, এদিক ওদিক কোন দিকে পড়িবে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবী হইতে আন্দাজ একশত ষাট হাজার মাইল উপরে গেলে তবে এইরূপ জায়গায় পৌঁছান যায়। কিন্তু কি উপায়ে সেখানে যাওয়া

যায় এবং সেখানে পৌঁছিলে কেমন মজা হয় একবার ভাবিয়া দেখ দেখি।

তোমরা জান যে এরোপ্লেনে করিয়া অনেক উপরে উঠা যায়, কিন্তু যেখানে বাতাস নাই সেখানে ত এরোপ্লেন যাইতে পারিবে না এবং মানুষও সেখানে গেলে বাঁচিবে না। ধরিয়া লও তুমি এরূপ একটি ব্যোমযান পাইলে যাহা বাতাসের রাজ্য ছাড়াইয়াও অনেক উপরে যাইতে পারে, কিন্তু ব্যোমযান সেখানে গেলেও তোমার নিজের জন্য বাতাসের দরকার; সেজন্য মনে কর এক দিন ঐ নূতন ব্যোমযানের একটি কামরা যথেষ্ট বাতাস, খাদ্য ও অন্যান্য দরকারী জিনিষে ভরিয়া লইয়া তুমি সেই অজানা জায়গার উদ্দেশে যাত্রা করিলে যেখানে কোন জিনিষের ওজনই নাই, এবং অনেক দিন পরে একদিন সত্যসত্যই সেখানে পৌঁছিয়া গেলে। সে এক অদ্ভুত জায়গা—যেমন তুমি কামরার ভিতর বেড়াইতে লাগিলে অমনি আস্তে আস্তে তোমার দেহ কামরার ছাদের দিকে উঠিতে লাগিল যতক্ষণ না তোমার মাথা ছাদে গিয়া ঠক্ করিয়া ঠেকিল। যখনই ছাদকে উপরে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা করিলে অমনি তুমি কামরার মেঝের দিকে নামিতে লাগিলে। জায়গাটি এমন মজার যে এখানে ব্যোমযানের কামরার ছাদ উপরে ও মেঝে নীচে, কিংবা ছাদ নীচে ও মেঝে উপরে তাহা বুঝিবার উপায় নাই—অর্থাৎ এখানে উঁচু নীচু বলিয়া কোন প্রভেদ নাই।

তুমি যদি একটি বড় ঘটি হইতে একটি গেলাসের ভিতর জল ঢালিতে যাও, ঘটির কোথায় ধরিলে জল পড়িবে তাহা ঠিক করিতেই পারিবে না। সাধারণতঃ বরাবরই দেখিয়া আসিয়াছ যে ঘটি নীচের দিকে উপুড় করিলে জল পড়ে; কিন্তু এখানে তুমি ঘটি কামরার ছাদের দিকে অথবা মেঝের দিকে যে দিকেই উপুড় কর, জল পড়িবে না; সুতরাং এখানে মেঝে নীচু কি ছাদ নীচু তাহার কোন ঠিক নাই—অর্থাৎ এখানে উঁচু নীচু বলিয়া কোন কথা নাই। ঘটি হইতে যখন জল পড়িল না তখন জল পাইতে হইলে উহার ভিতর হাত দিয়া বাহির করিতে হইবে; কিন্তু দেখিবে যে এক ফোঁটা জলও আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পড়িয়া যাইবে না—কারণ জলের ফোঁটাগুলির কোনই ওজন নাই, অর্থাৎ উহাদের উপর কোন দিকে কিছুমাত্র আকর্ষণ বা টান নাই। সাধারণতঃ ঘটি বা গেলাস কাৎ করিলে জল পড়ে, কারণ পৃথিবী উহাকে নিজের দিকে টানে, কিন্তু এখানে কোনই টান নাই সেজন্য জল কোন দিকে পড়িবে না। ঘটির ভিতর হইতে হাতে করিয়া জল উঠাইলে কাদার দলার মত জলের দলা হাতের উপর থাকিবে। বিরক্ত হইয়া ঘটিটিকে ফেলিয়া দাও, উহা পড়িবে না সেখানেই ভাসিতে থাকিবে। কিন্তু এখানে পিপাসা লাগিলে জল খাইবার উপায় কি? গেলাসে জল ঢালিবার উপায় নাই। হাতের উপর যে এক দলা জল আছে উহা কাৎ করিলেও মুখের ভিতর

যাইবে না। জল খাইতে হইলে ছোট এক দলা জল ঠোঁটের মধ্যে রাখিয়া মুখের ভিতর টানিয়া লইয়া জিব দিয়া গলার মধ্যে ঠেলিয়া দিতে হইবে। হাতের মধ্যে যে জলের দলাটুকু বাকি থাকিল উহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলে সোজা গিয়া কামরার দেওয়ালে আঘাত করিবে। দেওয়াল ভিজিয়া যাইবে কিন্তু এক ফোঁটা জলও দেওয়ালের গা গড়াইয়া পড়িবে না, একদলা কাদার মত দেওয়ালের গায়ে আট্‌কাইয়া থাকিবে।

যদি ব্যোমযানের কামরার মধ্যে একটি হাতী লইয়া যাও তবে আরও মজা হয়। হাতীটা আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় যদি সে তোমার পায়ের উপর তাহার মোটা একখানি পা চাপাইয়া দেয় তবে তোমার কিছুই হইবে না. কারণ তাহার কোন ওজন নাই; কিন্তু ভাবিয়া দেখ পৃথিবীর উপর হইলে কি কাণ্ড হইত! তোমার পা একেবারে পিষিয়া যাইত। তারপর হাতীটার পেটের তলে গিয়া উপরের দিকে জোরে ঠেলিয়া দিলে ঐ বৃহৎ জানোয়ারটা আপনি আপনি ছাদের দিকে উঠিতে থাকিবে। নীচে নামিবার জন্য যতই শুঁড় বা পা নাড়ুক, কোনই ফল নাই—ঐ বিশাল বপুখানি ভাসিতে ভাসিতে ছাদে গিয়া ধাক্কা লাগিবে।

এ জায়গায় বসিবার বা শুইবার জন্য চেয়ার, টেবিল, খাট কিছুরই দরকার নাই। হাত পা ছাড়িয়া দিয়া কামরার

মাঝখানেই হাওয়ার মধ্যে শুইয়া বা বসিয়া থাকিতে পারিবে। চা খাওয়ার জন্য চা'য়ের কাপ বা খাবারের থালা ঘরের মাঝখানে যেখানেই রাখ টেবিলের উপর রাখার মত সেখানেই থাকিয়া যাইবে। চা'য়ের কাপের উপরটা ছাদের দিকে ও খাবারের থালাখানি উহার উল্টা দিকে ফিরাইয়া রাখিলে কোনই ক্ষতি নাই, খাবার পড়িয়া যাইবে না। খাইবার সময় তোমার পা ছাদের দিকে ও মাথা মেঝের দিকে থাকিলেও কিছুই আসে যায় না।

ভাবিয়া দেখ দেখি—যদি এমন জায়গায় যাইতে পার তবে কেমন মজা হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সেখানে লইয়া যাইতে পারে: এমন কোন যান আজও তৈরী হয় নাই। যদি তোমরা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে এমন যান সত্যসত্যই কেহ তৈরী করিতে পারে তবে একশত ষাট হাজার মাইল উপরে উঠিয়া সেই অদ্ভুত জায়গায় পৌঁছিয়া একবার এই সকল বিষয় পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িও না।

উঁচু ও নীচু

তোমরা ভূগোলে নিশ্চয়ই পড়িয়াছ যে পৃথিবী গোলাকার। আচ্ছা, কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি এই গোলাকার পৃথিবীটার উপরে মানুষ-গরু, ভেড়া-ছাগল, হাতী-বাঘ, ইত্যাদি জীবজন্তু কি করিয়া বাস করিতেছে, আবার নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতির জলই বা ইহার উপর কি করিয়া আছে? ধর, পৃথিবী একটা খুব বড় ফুট্‌বল এবং ইহাকে শূন্যে ঝুলান আছে। ফুট্‌বলটা খুব বড় হইলে ইহার উপরের দিকে ইঁদুরের মত ছোট ছোট জানোয়ার স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। তেমনি তুমি বলিতে পার যে পৃথিবী গোলাকার হইলেও খুব বড় বলিয়া ইহার পিঠের উপর মানুষ, গরু ইত্যাদি জীবজন্তু অনায়াসে বাস করিতে পারে এবং নদী সমুদ্রের জলও গর্ত্তের ভিতর থাকিতে পারে। গোলাকার জিনিষ যত বড়ই হোক উহার উপর দিকে জীব জন্তুর বাস সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু পাশে বা নীচের দিকে জীবজন্তু বা জল কি করিয়া আছে ইহা তোমাদের নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্য লাগে। তাহা ছাড়া পৃথিবী ত সর্ব্বদাই

ঘুরিতেছে, সুতরাং ইহার পিঠের উপরে জীবজন্তু ও জল থাকিলেও ঘুরিবার সময় উহারা পড়িয়া যায় না কেন ইহাও এক মজার কথা।

তোমরা কলম্বসের নাম (Christopher Columbus) নিশ্চয়ই জান যিনি ১৪৯৮ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি ঘুরিয়া আসিয়া যখন বলিলেন যে আমাদের এই পৃথিবীটা গোলাকার, তখন তাঁহার কথা তখনকার লোক হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। তাহারা বলিল, "ইহা কি হইতে পারে ? পৃথিবী গোলাকার হইলে আমাদের উল্টা দিকে কি করিয়া লোকে উপরে পা ও নীচে মাথা রাখিয়া বাস করিবে ; আর সেখানে নদী বা সাগরের জল কি করিয়া থাকিবে—সব জলই ত পড়িয়া যাইবে ?"

স্যর আইজাক নিউটন তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম বাহির করেন ১৬৮২ সালে ; সুতরাং তাহার পূর্ব্বে কেহই জানিত না যে পৃথিবী সকল জিনিষকেই নিজের দিকে টানিয়া রাখিয়াছে, আর এই টানিয়া রাখার জন্যই গোলাকার হইলেও পৃথিবীর কোন দিক হইতে কিছু পড়িয়া যাইতে পারে না।

এখনও বোধ হয় তোমরা অনেকেই ভাব, 'আমরা বাংলা দেশে পৃথিবীর পিঠের যে দিকে বাস করিতেছি তাহার উল্টা দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার পেরু বা চিলি দেশে

মানুষের পা যদি পৃথিবীর পিঠের উপরে থাকে তবে মাথা নীচের দিকে রাখিয়া কেমন করিয়া তাহারা বাস করে।' কিন্তু উঁচু ও নীচু এই দুই কথার অর্থ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি। কোন জিনিষ উপর হইতে ছাড়িয়া দিলে যে দিকে পড়ে সেই দিককে নীচু ও তাহার বিপরীত দিককে আমরা উঁচু বলি। উপর হইতে সব জিনিষই পৃথিবীর টানের জোরে উহার উপরে আসিয়া পড়ে বলিয়া পৃথিবীর দিকটা অর্থাৎ আমাদের পা'য়ের দিকটা নীচু ও তাহার বিপরীত দিকটা অর্থাৎ মাথার দিক উঁচু। যদি আমরা পৃথিবীর উপর না থাকিয়া চন্দ্রের উপর থাকিতাম তখন চন্দ্রই আমাদিগকে তাহার দিকে টানিয়া রাখিত; আর সেখানে আমাদিগের পায়ের দিক অর্থাৎ চন্দ্রের দিক হইত নীচু। সেখান হইতে পৃথিবীকে আমরা উপরে দেখিতাম—এখন চন্দ্রকে যেমন দেখি।

আমরা পৃথিবীর যে দিকে আছি দক্ষিণ আমেরিকা যদিও ঠিক তাহার উল্টা দিকে আছে তথাপি ঠিক আমাদেরই মত সেখানেও মানুষের পা'গুলা পৃথিবীর উপর ও মাথা আকাশের দিকে থাকে এবং সেখানেও পা'য়ের দিকটা অর্থাৎ পৃথিবীর দিকটা নীচু ও মাথার দিক অর্থাৎ আকাশের দিক উঁচু। এখানকার মত তাহাদেরও মাথার উপর চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, সবই আছে। তাহারাও আকাশের দিকে ঢিল ছুড়িলে উহা পুনরায় পৃথিবীর উপর ফিরিয়া

আসে। মোটের উপর এখানে আমরা যেরূপ আছি সেখানে তাহারা ঠিক সেইরূপ আছে। তবে তফাৎ এই যে দক্ষিণ আমেরিকা আমাদের ঠিক উল্টা দিকে আছে বলিয়া তাহারা শূন্যের ভিতর যে দিকটাকে 'উচু' বলে আমরা সেই দিকটাকে 'নীচু' বলি। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশ আমাদের বাংলা দেশের প্রায় ঠিক উল্টা দিকে আছে; সুতরাং পেরু দেশে ভূপৃষ্ঠ হইতে উপরের দিকে একটি বল ছুড়িলে উহা যে দিকে যায় বাংলাদেশে উপরের দিকে বল ছুড়িলে তাহার ঠিক উল্টা দিকে যায়, অর্থাৎ পেরুর বলটা যখন ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাশের দিকে যায় বাংলাদেশের বলটি তখন আকাশের দিক হইতে ভূপৃষ্ঠের দিকে আসে। আবার দেখ, আমরা যখন সূর্য্যের আলো পাই তখন পেরুদেশে আঁধার, অর্থাৎ যখন আমাদের এখানে সকাল হয় তখন সেখানে সন্ধ্যা, আমাদের এখানে যখন সন্ধ্যা তখন সেখানে সকাল। দক্ষিণ আমেরিকায় যদি তোমার কোন বন্ধু থাকে তবে কলিকাতা হইতে ঠিক সন্ধ্যার সময় বেতার যোগে যদি তাহাকে কলিকাতার সময় জানাও সে সংবাদ প্রায় তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট পৌঁছিবে; এবং তোমার বন্ধু জানিতে পারিবে যে কলিকাতায় তখন কেবল সন্ধ্যা হইতেছে; আবার তোমার বন্ধু যদি বেতার যোগে তখনই সেখানকার সময় তোমাকে জানায় তবে বুঝিতে পারিবে সেখানে তখন কেবল সূর্য্যোদয় হইতেছে।

একটা বড় ফুট্‌বলের উপর চারিদিকে পুতুল বা অন্য জিনিষ পত্র রাখিয়া তাহাদের প্রত্যেকটিকে যদি সূতা দিয়া বাঁধিয়া ফুট্‌বলটির ভিতরদিক হইতে টানিয়া রাখা যায় তবে তাহারা আর পড়িতে পারে না। আমরা যদিও সূতা বা মোটা দড়ি দিয়া পৃথিবীর সহিত বাঁধা নাই তথাপি কোন অদৃশ্য উপায়ে পৃথিবী আমাদের সকলকে সর্ব্বদাই ভিতরের দিকে টানিতেছে ইহা নিশ্চয়। এই টান আছে বলিয়াই পৃথিবীর চারিদিকে মানুষ, গরু, ও অন্যান্য জীব-জন্তু স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, আর নদী, সাগর ইত্যাদিরও অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে। ফুট্‌বলটি শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিলে উহার উপরের চারিদিকের পুতুলগুলির পা'য়ের দিকে ফুট্‌বল ও মাথার দিক শূন্য ; আমাদের পৃথিবীও ঠিক সেইরূপ শূন্যে অবস্থিত আছে এবং উহার উপরে চারিদিকে যে সকল জীব-জন্তু বাস করিতেছে ফুট্‌বলের উপরের পুতুলগুলির ন্যায় তাহাদেরও সকলের পা'য়ের দিকে অর্থাৎ নীচে পৃথিবী ও মাথার দিকে অর্থাৎ উপরে শূন্য বা আকাশ। সুতরাং 'নীচু' কথার প্রকৃত অর্থ সেই জিনিষের দিক যাহা আমাদের সকলকে সর্ব্বদাই টানিতেছে—আর 'উঁচু' কথার অর্থ তাহার বিপরীত দিক।

—:০:—

ভারকেন্দ্র

তুমি কতকগুলি পয়সা লও এবং টেবিলের উপর ঠিক একটির উপর আর একটি রাখিয়া উঁচু করিয়া সাজাও। সাজাইবার সময় যদি একটির ঠিক উপরে আর একটি রাখিয়া সোজা করিয়া সাজাও তবে দেখিবে যে অনেকগুলি পয়সা এইরূপে রাখিতে পারিবে কিন্তু পয়সাগুলিকে একটির উপর আর একটি যদি আঁকাবাঁকা করিয়া রাখ তবে গোটাকয়েকের বেশী রাখিতে গেলেই শেষে উহারা একদিকে কাৎ হইয়া পড়িয়া যাইবে।

ইহার কারণ বলিতেছি শুন। প্রত্যেক জিনিষের ওজন আছে তাহাত জানই, আর ওজনটা যে পৃথিবীর টান ছাড়া আর কিছুই নয় তাহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কোন জিনিষকে দড়ি দিয়া টানিতে গেলে তাহার যে কোন এক জায়গায় বাঁধিয়া তাহাকে টানিতে পারা যায়, কিন্তু সকল জিনিষের ভিতরে মাত্র একটি নির্দ্দিষ্ট ছোট স্থান আছে শুধু যেখান হইতে পৃথিবীর টান কার্য্য করে। এই ক্ষুদ্র স্থানটি সব জিনিষের আশে পাশে বা উপরে নীচে—যেদিকে উহার ভার বেশী সেই দিকে—থাকে। একটি পয়সার ভার সকল দিকেই

সমান সেজন্ত উহার ঠিক মধ্যস্থল অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর টান কার্য্য করে। পয়সার ভিতর যতটা তামা আছে তাহার পরিমাণ সব দিকে সমান না হইয়া যদি একদিকে বেশী ও একদিকে কম হইত তবে ঐ ক্ষুদ্র স্থানটি কেন্দ্রে না থাকিয়া যেদিকে তামার পরিমাণ বেশী সেই দিকে থাকিত। এই স্থানটির নাম পয়সার—"**ভারকেন্দ্র**"। একটি পয়সার উপর যখন আর একটি রাখিবে তখন দ্বিতীয়টির ভারকেন্দ্র প্রথমটির ভারকেন্দ্রের ঠিক উপরে যে খাড়া লাইন আছে তাহার উপরে থাকিলে পৃথিবী একই সোজা লাইনে দুইটিকে নীচের দিকে টানিতে থাকিবে, কিন্তু একটির উপর আর একটি যদি আঁকাবাঁকা করিয়া রাখ তবে প্রত্যেকটির ভারকেন্দ্র বিভিন্ন লাইনে থাকিবে, এবং এইরূপে সাজাইতে সাজাইতে যে পয়সার স্তম্ভ হইবে তাহার ভারকেন্দ্র হইতে লম্বরেখা অর্থাৎ খাড়া লাইন যদি তলদেশের পয়সার বাহিরে আসিয়া পড়ে তবে স্তম্ভটি ক্রমে একদিকে হেলিয়া অবশেষে পড়িয়া যাইবে।

১নং চিত্রে দেখ সবদিকে অর্থাৎ ছয় দিকে সমান এমন কতকগুলি কাঠের টুক্‌রা লওয়া হইয়াছে। উহাদের একটির উপর আর একটি টুক্‌রা পয়সার মত একইরূপে রাখিতে রাখিতে স্তম্ভটির ভারকেন্দ্র ক্রমে বাঁ-দিকে সরিয়া যাইবে। (দেখ, প্রথমটির ভারকেন্দ্র 'চ'এ, দ্বিতীয়টির 'ছ'এ, ইত্যাদি)। এইরূপে যখন ভারকেন্দ্র বাঁ-দিকে সরিতে সরিতে

নীচের কাষ্ঠখণ্ডটির বাহিরে আসিয়া পড়িবে তখন স্তম্ভটি ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

বাড়ী তৈরী করিবার সময় রাজমিস্ত্রীদের হাতে সূতা দিয়া ঝুলান একটি সীসার বল থাকে তাহা বোধ হয় দেখিয়াছ। সূতা দিয়া ঝুলান ঐ বলকে 'ওলন' বলে। মিস্ত্রী যখনই একখানির উপর আর একখানি ইট গাঁথে তখনই উপরের ইটখানির গায়ে ওলন দড়ি লাগাইয়া দেখে যে দুইখানি ইট ঠিক একই খাড়া লাইনে গাঁথা হইয়াছে কিনা। যদি তাহা না হয় তবে এইরূপে গাঁথিতে গাঁথিতে উপরের ইটের ভারকেন্দ্র নীচের ইটের বাহিরে আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা, এবং এরূপ হইলে ইটের স্তম্ভের অবস্থা পূর্ব্বে যে কাঠের টুক্‌রার স্তম্ভের কথা বলিয়াছি তাহার মত হইবে—অর্থাৎ একদিকে হেলিয়া পড়িয়া যাইবে।
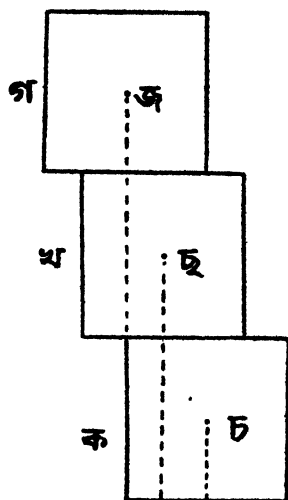
১নং চিত্র

'ক', 'খ' ও 'গ'—তিনটি কাষ্ঠখণ্ড এবং 'চ', 'ছ' ও 'জ'—ইহাদের ভারকেন্দ্র। 'গ'এর উপর আর একটি কাষ্ঠখণ্ড, ঐরূপে রাখিলেই স্তম্ভটি ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

একখানি তক্তার উপর এক বালতি (ব) জল রাখিয়া দেখ (২নং চিত্র) যে বালতিটি ঠিক বসিয়া থাকিবে, কোন দিকে হেলিয়া পড়িবে না; কারণ জলভরা বালতিটির ভারকেন্দ্র (ক) যেখানে আছে সেখান
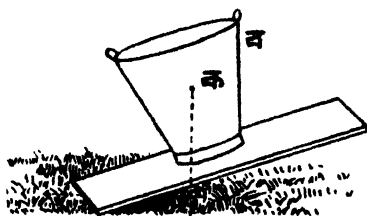
২ নং চিত্র

তক্তা উঁচু করিলে বালতির ভারকেন্দ্র(ক) হইতে লম্বরেখা অপর দিকে সরিয়া যাইবে।

হইতে ঠিক খাড়া লাইন (ইহাকে লম্বরেখা বলে) নীচের দিকে টানিলে ঐ লাইন বালতির তলদেশ তক্তার যতটা জায়গা দখল করিয়া আছে তাহার ভিতর দিয়া যাইবে। পৃথিবী তাহাকে ঠিক ঐ খাড়া লাইনে বা লম্ব-রেখায় টানিতেছে বলিয়া বালতিটি সোজা হইয়া বসিয়া থাকিবে। এখন যদি তক্তাটির একদিক ধরিয়া আস্তে আস্তে উঁচু করিতে থাক তবে একটু পরেই বালতিটি অপরদিকে কাৎ হইয়া পড়িয়া যাইবে, কারণ তক্তা উঁচু করিলে বালতিটি যতই বাঁকিতে থাকিবে উহার ভারকেন্দ্র(ক) হইতে লম্বরেখা তলদেশের ততই এক পার্শ্বে সরিয়া যাইতে

থাকিবে (২নং চিত্র দেখ), এবং যখনই ঐ রেখা তলদেশের বাহিরে যাইবে তখনই বালতিটি কাৎ হইয়া পড়িয়া যাইবে।
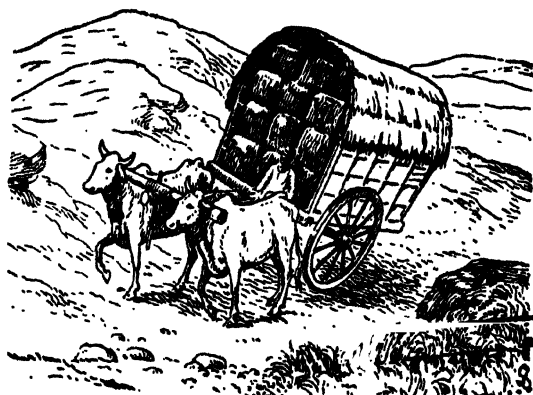
৩ নং চিত্র

মাল বোঝাই গরুর গাড়ী।

যখন কোন মাল বোঝাই গাড়ী উঁচুনীচু গড়ানে জায়গার উপর দিয়া যায় তখন উহার ভারকেন্দ্র হইতে লম্ব-রেখা যদি দুই চাকার ভিতরে যে জায়গা থাকে তাহার বাহিরে আসিয়া পড়ে তবে গাড়ীখানি তখনই উল্টাইয়া যাইবে (৩নং চিত্র দেখ)। আজকাল কলিকাতা সহরে যে বড় বড় দোতালা বাস্‌ চলে ঐরূপ কোন গাড়ীর আরোহীগণ এক তলায় না বসিয়া সকলেই যদি দোতালায় বসেন তবে গাড়ীর অধিক ভার উপরের দিকে থাকায় উহার ভারকেন্দ্র উঁচুতে থাকিবে। এরূপ ক্ষেত্রে গাড়ী একটু অধিক হেলিয়া গেলে

উহার ভারকেন্দ্র হইতে লম্বরেখা চাকার বাহিরে আসিয়া পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী উল্টাইয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা। সেজন্য এ সব গাড়ীতে আগেই নীচের তলায় সকলের বসা উচিত কারণ তাহাতে ভারকেন্দ্র নীচের দিকে থাকিবে এবং সেখান হইতে লম্বরেখা চাকার বাহিরে যাইবার ও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী উল্টাইবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকিবে।

৪ নং চিত্র

এক জনের হাতে জলের বালতি ও অপরের পিঠে বোঝা। চলিবার সময় উভয়কেই শরীর হেলাইয়া চলিতে হইবে।

আমরা যখন দাঁড়াইয়া থাকি তখন আমাদের ভারকেন্দ্র হইতে লম্বরেখা দুই পায়ের মধ্যের জায়গা দিয়া যায়, কিন্তু যখন আমরা কোন ভারী জিনিষ পিঠের উপরে রাখি বা হাতে ঝুলাইয়া রাখি, তখন ভারকেন্দ্রের জায়গা বদ্‌লাইয়া

যায়। তখন যাহাতে ভারকেন্দ্র হইতে লম্বরেখা আমাদের দুই পায়ের মধ্যের জায়গা দিয়া যায় সেজন্য শরীরকে একদিকে হেলাইতে হয় এবং সেই কারণে তখন আমাদের দাঁড়াইবার বা চলিবার ভঙ্গি বদ্‌লাইয়া যায়। ৪নং চিত্রে দেখ যে একজন পিঠের উপর বোঝা লইয়াছে বলিয়া তাহার শরীরকে সম্মুখ দিকে হেলাইয়া রাখিতে হইয়াছে এবং আর একজন বাঁ হাতে জলের বালতি লইয়াছে বলিয়া শরীরকে ডানদিকে হেলাইয়া রাখিতে হইয়াছে। আমাদের এরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে কোন ভারী জিনিষ পিঠে বা হাতে লইলেই অমনি দেহ একদিকে হেলিয়া যায়—যাহাতে আমরা উল্টাইয়া পড়িয়া না যাই। কোন্‌দিকে কতটা হেলিতে হইবে তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিতে হয় না, সে কার্য্য আপনিই হইয়া যায়।

৫ নং চিত্রে দেখ একজন একটি আঙ্গুলের উপর একটি ছড়ি সোজা করিয়া রাখিয়াছে। এস্থলে ছড়িটির ভারকেন্দ্র হইতে লম্বরেখা যেখানে ছড়িটি আঙ্গুল স্পর্শ করিয়া আছে তাহার ভিতর দিয়া গিয়াছে। ছড়িটি এদিক ওদিক হেলিয়া গেলেই ঐ লম্বরেখা অঙ্গুলের বাহিরে চলিয়া যায় এবং তখনই উহা পড়িয়া যাইতে চায়। তৎক্ষণাৎ হাত সরাইয়া উহাকে এমন স্থানে আনিতে হয় যাহাতে ঐ রেখা পুনরায় আঙ্গুলটির ভিতর দিয়া যায়।

কোন কোন সার্কাসে তোমরা তারের উপর দিয়া লোক হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়াছ। ঐরূপ খেলা করিবার সময় তাহারা প্রায়ই হাতে একটি খোলা ছাতা রাখে। ঐ ছাতা ও নিজের শরীরকে হেলাইয়া তারের উপর এমন ভাবে থাকিতে হয় যাহাতে তাহার ভারকেন্দ্র হইতে লম্বরেখা ঠিক তারের ভিতর দিয়া যায়।
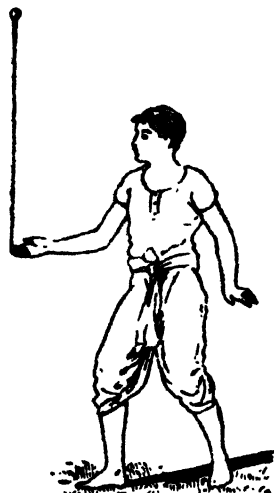
৫ নং চিত্র
ছড়ির ভারকেন্দ্র হইতে লম্ব-রেখা আঙ্গুলের ভিতর দিয়া গিয়াছে।

যে জিনিষের নীচের দিকে বেশী ভার থাকে তাহার ভারকেন্দ্রও তত নীচের দিকে থাকিবে এবং সেই সব জিনিষের উল্টাইয়া যাইবার সম্ভাবনাও তত কম হইবে। আর যে সব জিনিষের উপর দিক বেশী ভারী তাহাদের উল্টাইবার সম্ভাবনাও তত অধিক। তোমরা বোধ হয় এক রকম দোয়াত দেখিয়াছ যেগুলি কাৎ করিয়া দিলেও পুনরায় সোজা হইয়া বসে। উহাদের তলায় সীসা ইত্যাদি দিয়া নীচের দিক খুব ভারী করিয়া রাখা থাকে। কাৎ করিয়া দিলেও উহাদের ভারকেন্দ্র খুব নীচে থাকায় সেখান

হইতে লম্বরেখা টানিলে টেবিল বা মাটির যতটা জায়গা দোয়াতের তলদেশ অধিকার করিয়া থাকে ঐ রেখা তাহার ভিতর দিয়া যায়, সেজন্য দোয়াতটি উল্টাইয়া না গিয়া পুনরায় সোজা হইয়া বসে।

নদীর উপর দিয়া চলিবার সময় যে নৌকার উপর দিকে বেশী মাল বোঝাই থাকে একটু ঝড় বাতাস হইলেই তাহার শীঘ্র উল্টাইয়া যাইবার অধিক সম্ভাবনা থাকে, সেজন্য নৌকা বা জাহাজে মাল বোঝাই করিতে হইলে প্রথমে উহার খোলের ভিতরের জায়গা বোঝাই করিতে হয়।

ঢেউয়ের খেলা

ঢেউ বলিলে তোমরা কিসের ঢেউ বোঝ বল ত? নিশ্চয়ই জলের ঢেউ, কারণ জলের ঢেউ ছাড়া আর কোন ঢেউ ত তোমরা দেখিতে পাও না। পুকুরে, নদীতে বা সাগরে ছোট বড় নানারকম জলের ঢেউ তোমরা দেখিয়াছ, কিন্তু এই সকল জলের ঢেউ ছাড়া আকাশে বাতাসে চারিদিকে যে আরও কত রকম ঢেউয়ের খেলা চলিতেছে তাহার কি কোন খবর রাখ? আবার এই সকল ঢেউ তোমাদের চোখে, কাণে ও দেহের চারিদিকে সর্ব্বদাই ধাক্কা মারিতেছে তাহাও তোমরা বুঝিতে পার না। তোমরা হয়ত বলিবে যে ইহা সত্য নয়, কারণ কোন ঢেউ আসিয়া যদি গায়ে ধাক্কা দেয় তবে সেই ধাক্কার জোরে নিশ্চয়ই তাহাকে বুঝিতে পারা যায়। আচ্ছা, জলের ঢেউয়ের কথাই ধর, সাগরের বড় বড় ঢেউ যদি আসিয়া ধাক্কা দেয় তবে তাহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু পুকুরের জলের ভিতর চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে কখন তাহার ছোট ছোট ঢেউগুলি আসিয়া গায় লাগে তাহা কি বুঝিতে পারা যায়? সুতরাং ঢেউ গায়ে লাগিলেই যে বুঝিতে পারা যায় এ কথাটি ঠিক

নয়। যখন এই সব নূতন নূতন ঢেউয়ের রহস্য তোমাদের কাছে প্রকাশ করিয়া দিব তখন বুঝিতে পারিবে যে সত্য সত্য কত রকম ঢেউয়ের ধাক্কা সর্ব্বদাই তোমাদের খাইতে হইতেছে।

মনে কর রাত্রি হইয়াছে। অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়া তুমি কিছুই দেখিতে পাইতেছ না। তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটি জ্বালিলে—আর ঘরের ভিতরের চেয়ার, টেবিল, বই, কাপড় সব দেখিতে পাইলে। কেন দেখিতে পাইলে বলত? লণ্ঠনটি জ্বালিলেই আগুন হইল। সেই আগুন হইতেই আলোর উৎপত্তি এবং সেই আলোই যে ছুটিয়া আসিয়া ঘরের জিনিষপত্র ও তোমার চোখে মুখে পড়িতেছে তাহা বেশ বুঝা যায়। সকালবেলা সূর্য্য উঠিলেই সূর্য্যের আলো বহুদূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া চারিদিকের বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, গাছপালা সব জিনিষের উপর পড়ে এবং তখন সেই সব জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই আলো জিনিষটা কি এবং কেমন করিয়া ইহা এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় ছুটিয়া যায়?

পুকুর হইতে বাড়ীতে জল আনিতে হইলে কাহাকেও উহা ঘাড়ে করিয়া বহিয়া আনিতে হয়। কিন্তু নদীর উপর নৌকা ছাড়িয়া দিলে উহা স্রোতের অনুকূলে আপনিই ভাসিয়া চলিয়া যায়; এবং জোর বাতাসে ভর করিয়া শুষ্ক পাতা-লতা বা ধূলা-বালি স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে

পারে। তাহা হইলে দেখিতেছ যে কোন জিনিষকে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় লইতে হইলে ঢেউয়ের উপর ছাড়িয়া দিয়াই হোক বা ঘাড়ে করিয়াই হোক, কোন উপায়ে তাহাকে বহিয়া আনিতে হয়। যখন লণ্ঠনের আলো ছুটিয়া আসিয়া ঘরের চারিদিকে পৌঁছাইয়া গেল, অথবা সূর্য্যের আলো আসিয়া পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিল তখন সেই সব আলো কে ও কিরূপে বহিয়া আনিল বলত ? হঠাৎ তোমার মনে হইবে যে নিশ্চয়ই বাতাসে ভর করিয়া আলো চারিদিকে ছুটিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু ইহা সত্য নয়। কারণ ঘরের ভিতর বাতাস আছে বলিয়া সেখানে লণ্ঠনের আলোর বাতাসে ভর করিয়া চলা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যেখানে আদৌ বাতাস নাই সেখান হইতে আলো কি করিয়া আসে ? তোমরা বোধ হয় জান যে পৃথিবীর যত উপরে যাইবে বাতাস ততই কমিয়া যাইবে। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মাইল উপরে বাতাস অতি সামান্য আছে ; দুই এক হাজার মাইল উপরে বাতাস নাই বলিলেই হয়। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহাদির নিকট ত বাতাসের চিহ্নমাত্রও নাই। সুতরাং সূর্য্যের আলো যে বাতাসে ভর করিয়া আসে ইহা সত্য হইতে পারে না।

আলো যে বাতাসে ভর করিয়া চলে না বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। যে জিনিষের উপর ভর করিয়া আলো এধার ওধার ছুটিয়া বেড়ায়, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করিয়াছেন এবং তাহার নাম

দিয়াছেন "ইথার"। এই ইথার জিনিষটি বড় মজার। যেমন বাতাস দেখিতে পাওয়া যায় না তেমনি ইথারও দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহা সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে। ইহার গতিবিধি নাই এমন স্থান নাই। ইথার এত সূক্ষ্ম যে ইট, কাট, লোহা, পাথর, জল, মাটি ইত্যাদি প্রত্যেক জিনিষের ভিতরে ইহা বর্ত্তমান। তোমরা বোধ হয় জান যে জগতের ছোট বড় প্রত্যেক জিনিষ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সংযোগে গঠিত। এই অংশগুলির নাম অণু। এই অণুগুলি আবার তার চেয়েও ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা গঠিত তার নাম পরমাণু। বাতাসের মত হাল্‌কা, জলের মত তরল বা লোহার মত কঠিন সকল জিনিষেরই অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে বেশ ফাঁক থাকে। অবশ্য সে ফাঁক এত সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (microscope) দ্বারাও তাহা দেখা যায় না। বাতাস ত সেখানে প্রবেশ করিতেই পারে না; কিন্তু ইথার এত সূক্ষ্ম যে উহা প্রত্যেক জিনিষের অণুগুলির মধ্যস্থিত ফাঁক দখল করিয়া বসিয়া থাকে, এবং ঘরের খোলা দরজা জানালার ভিতর দিয়া বাতাসের যাতায়াত করার ন্যায় ইথার সেই অণুগুলির ফাঁকের ভিতর দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করে।

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, 'যে জিনিষ কেহ কখনও দেখে নাই বা দেখিতে পাইবেও না তাহার অস্তিত্ব অর্থাৎ তাহা যে

সত্যই আছে—একথা কেন মানিয়া লইব?' কিন্তু বাতাস ত তোমরা দেখিতে পাও না, তবে তাহার অস্তিত্ব মানিয়া লও কেন? তুমি বলিবে "দেখিতে না পাওয়া গেলে কি হয়? বাতাস আমাদের গায়ে লাগিলে বুঝিতে পারি। তাহা ছাড়া ইহা হাল্‌কা জিনিষকে উড়াইয়া লইয়া যায়, গাছের পাতাকে কাঁপাইয়া দেয় এবং জোরে বহিলে ইহা গাছকেও উড়াইয়া দেয়।" তাহা হইলে বুঝা গেল যে চোখে না দেখা গেলেও বাতাস যে নিজের কার্য্যের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করে ইহা তোমরা স্বীকার করিয়া লইতেছ। অনেক সময় গরম জিনিষ ও ঠাণ্ডা জিনিষ চোখে দেখিয়া বুঝিতে পার না, কিন্তু গরম জিনিষটি হাত দিয়া ধরিলে হাতটি যখন ছ্যাঁক করিয়া উঠে তখনই বুঝিতে পার যে উহা গরম। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ যে চোখে দেখিতে পাইনা বলিয়া বিশ্বাস করি না এ কথা বলা চলে না। কাজ দেখিয়া অনেক সময় বিশ্বাস করিতে হয়। আর বৈজ্ঞানিকেরা কি সহজে ইথারের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছেন! অনেক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ পাইয়া তবে স্বীকার করিয়াছেন।

এখন দেখিতে হইবে যে ইথার কি উপায়ে আলোককে একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহিয়া আনে। ধূলাবালি যেমন বাতাসে ভর করিয়া এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় চলিয়া যায়, আলো কি সেইরূপ উপায়ে ইথারে ভর করিয়া চলে? বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়াছেন, "না, তা নয়।

আলো এরূপে অগ্রসর হয় না"। তাঁহারা অনেক পরীক্ষা করিয়া ইহার রহস্য বাহির করিয়াছেন। তোমরা যদি পুকুরের স্থির জলে একটি ঢিল ফেল তবে দেখিবে যে যেখানে ঢিল পড়িবে সেখানে জলের ঢেউ উঠিবে এবং ঐ ঢেউগুলি ক্রমশঃ বড় হইয়া পুকুরের চারিদিকের জলকে ছাইয়া শেষে কিনারায় গিয়া ধাক্কা মারিবে। ঢেউগুলি দেখিলে মনে হইবে যে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক জায়গার জল বুঝি অন্য জায়গায় যাইতেছে, অর্থাৎ যেখানে প্রথমে ঢিল ফেলিয়াছ সেখানকার জলই বুঝি আঁকিয়া বাঁকিয়া শেষে কিনারায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি তাহা নয়। ঢেউয়ের উপর কাগজ, পাতা বা ঐরূপ কোন একটি হাল্‌কা জিনিষ রাখিলে দেখিতে পাইবে যে উহা জলের উপর একই জায়গায় উঠা নামা করিতেছে, ঢেউয়ের সঙ্গে চলিয়া যাইতেছে না। সুতরাং এক জায়গার জল অন্য জায়গায় যায় না ; যে জায়গায় তুমি ঢিল ফেলিয়া জলকে নাড়াইয়া দিয়াছ সেখানকার জলকণাগুলি উঠা নামা করিয়া নাচিয়া ঢেউ সৃষ্টি করে ; এবং তাহাদের নাড়া লাগিয়া পাশের জলকণাগুলিও নাচিতে আরম্ভ করে। এইরূপে ঢেউ একস্থান হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া যায়, কিন্তু এক জায়গার জল অন্য জায়গায় যায় না।

তোমাদের যে ইথারের কথা বলিয়াছি বৈজ্ঞানিকেরা

বলেন যে ঐ ইথারের ঢেউ হইতেই আলোর উৎপত্তি। ঢিল ফেলিয়া যেমন জলকে কাঁপাইয়া দাও সেইরূপ আমরা যে ইথার সমুদ্রে বাস করিতেছি সেই ইথারকেও নানারকমে কাঁপাইয়া দেওয়া যায়। ইথারের এই কাঁপুনি বা ঢেউই আমাদের আলো। লাল, নীল, সবুজ, হল্‌দে ইত্যাদি নানা রংয়ের আলো সবই ইথারের ছোট বড় ঢেউ হইতে উৎপন্ন। যখন তুমি লণ্ঠন জ্বালাও তখন উহার ভিতরের তেল বাষ্প হইয়া জ্বলিতে আরম্ভ করে ও সেই সময় ঐ বাষ্পের অণুপরমাণুগুলি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। জলে ঢিল ফেলিলে জলকণাগুলি নাচিয়া নাচিয়া যেমন ঢেউ সৃষ্টি করে, সেইরূপ এখানেও তেলের বাষ্পের অনুপরমাণুগুলির কাঁপুনি দ্বারা ইথারের ঢেউ সৃষ্ট হয় এবং সেই ঢেউ তখন বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

পুকুরের জলে ঢিল ছুড়িলে সেখান হইতে জলের ঢেউ ক্রমশঃ কিনারায় পৌঁছিতে কত সময় লাগে তাহা বোধ হয় তোমরা অনেক সময় দেখিয়াছ, কিন্তু ইথারের ঢেউ—অর্থাৎ আলোর ঢেউ—যে কত জোরে চলে তাহা শুনিলে তোমরা অবাক হইয়া যাইবে। এই ঢেউ চোখে দেখা না গেলেও ইহা কত জোরে চলে বৈজ্ঞানিকেরা তাহা হিসাব করিয়া ফেলিয়াছেন। সে বেগ কত শুনিবে? প্রতি সেকেণ্ডে একশত ছিয়াশী হাজার মাইল; অর্থাৎ তোমার কাছে একটা প্রকাণ্ড আলো জ্বালিলে সেই আলোর ঢেউ এক সেকেণ্ডের

ভিতর একশত ছিয়াশী হাজার মাইল দূরে চলিয়া যাইবে। এরূপ বেগ তোমরা ধারণা করিতেই পারিবে না। আমাদের এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর বেড় মাত্র পঁচিশ হাজার মাইল। তাহা হইলে হিসাব করিয়া দেখ যে এক জায়গা হইতে আরম্ভ করিয়া ইথারের ঢেউ মাত্র এক সেকেণ্ড সময়ে পৃথিবীকে প্রায় সাড়ে সাতবার ঘুরিয়া আসিতে পারে। জগতে কোন জিনিষ এত জোরে চলিতে পারে না। রেলগাড়ী বড় জোর ঘণ্টায় ষাট মাইল অর্থাৎ মিনিটে এক মাইল চলে, এবং আজকাল এরোপ্লেন অনেক জোরে চলে বটে, কিন্তু বড় জোর ঘণ্টায় চারিশত মাইল অর্থাৎ মিনিটে ছয় মাইলের একটু বেশী চলে। সূর্য্য আমাদের পৃথিবী হইতে নয় কোটি কুড়ি লক্ষ মাইল দূরে আছে। তুমি যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে একখানি রেলগাড়ীকে দিনরাত্রি সমান ভাবে ছুটাইয়া সূর্য্যের দিকে যাও তবে সেখানে পৌঁছিতে তোমার প্রায় পৌনে তুইশত বৎসরের কাছাকাছি লাগিয়া যাইবে। আর তুমি যদি খুব ভাল এরোপ্লেনে করিয়া সূর্য্যে পৌঁছাইবার জন্য যাত্রা কর তবে দিনরাত্রি সমান বেগে চলিয়াও ত্রিশ বত্রিশ বছরের আগে সেখানে পৌঁছিতে পারিবে না—অর্থাৎ এখন যাত্রা করিলে সূর্য্যে পৌঁছিতে পৌঁছিতে তুমি প্রায় বুড়া হইয়া যাইবে ; কিন্তু সূর্য্য হইতে আলোর ঢেউ আমাদের পৃথিবীতে আসিতে কতটুকু সময় লাগে জান ? মাত্র সওয়া আট

মিনিট। সুতরাং দেখা গেল আলোর ঢেউ এত বেগে ছোটে যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে পৌঁছিতে কোন সময় লাগে না বলিলেই চলে। সেজন্য এক জায়গায় আলো জ্বালিলে তৎক্ষণাৎ আলোর ঢেউগুলি চারিদিকে ছুটিয়া চলে, এবং আমরা দূরে থাকিলেও প্রায় সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের কাছে পৌঁছিয়া আমাদের চোখে আসিয়া ধাক্কা দেয়। চোখে এই ঢেউয়ের ধাক্কা লাগিলেই আমরা দেখিতে পাই।

এতক্ষণ ধরিয়া তোমাদের কেবল আলোর ঢেউয়ের কথা বলিলাম, কিন্তু ইথারের ঢেউ হইতে যে শুধু আলোর উৎপত্তি হয় তাহা নয়। ইহার ছোড় বড় ঢেউ হইতে আরও কোন্ কোন্ জিনিষ উৎপন্ন হয় তাহা বলিতেছি শুন। এক জায়গায় আগুন জ্বালিলে কিছু দূরে দাঁড়াইয়াও যে গরম বোধ হয় এবং রৌদ্রে দাঁড়াইলেও যে গরম লাগে তাহাও ইথারের ঢেউয়ের কাজ। কোথাও আগুন জ্বালাইলে সেখান হইতে ইথারের ছোট বড় নানারকম ঢেউ ছুটিয়া বাহির হয়। উহাদের মধ্যে কেবল মাত্র কতকগুলি আমাদের চোখে ধাক্কা মারিলে আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদের চেয়ে বড় বা ছোট ঢেউগুলি চোখে ধাক্কা মারিলেও আমরা দেখিতে পাই না। যে ঢেউগুলি আলোর ঢেউয়ের চেয়ে ঠিক বড় সেগুলি আমাদের দেহের বা অন্য যে কোন জিনিষের উপর পড়িলে উহার ভিতর

প্রবেশ করিয়া অণুপরমাণুগুলিকে কাঁপাইয়া দেয়, এবং উহার জন্য আমাদের দেহের বা অন্য জিনিষের উত্তাপ বাড়িয়া যায়। সেজন্য আগুনের পাশে দাঁড়াইলে তুমি গরম বোধ কর, এবং থালা ঘটিবাটি ইত্যাদি থাকিলে সেগুলিও গরম হইয়া যায়।

আলোর ও তাপের ঢেউ ছাড়া রঞ্জেন-রশ্মি (X-rays) এবং বেতার টেলিফোনিও ঐ একই ইথারের ঢেউয়ের কাজ। তোমাদের মনে হইতে পারে যে একই ইথারের ঢেউ হইতে কিরূপে এইরূপ বিভিন্ন জিনিষের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সবই ইথারের ঢেউ হইলেও উহাদের দৈর্ঘ্য এক নয়। কোন কোন ঢেউ খুব ছোট, আবার কতকগুলি খুব বড়। এই ছোট বড় ঢেউগুলি এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার উৎপন্ন করে। আলোর ঢেউ, তাপের ঢেউ, রঞ্জেন-রশ্মির ঢেউ বা বেতারের ঢেউ কোন্‌টি কত লম্বা বৈজ্ঞানিকগণ তাহাও ঠিক করিয়াছেন, শুধু বেতারের ঢেউ ছাড়া অন্যগুলি এত ছোট যে তোমরা তার ধারণা করিতেই পারিবে না।

তোমরা বোধ হয় জান যে একটা পয়সার মাঝামাঝি মাপিলে এক ইঞ্চি লম্বা হয়। ঐরূপ এক ইঞ্চি জায়গার ভিতরে তেত্রিশ হাজার হইতে প্রায় সাড়ে বাষট্টি হাজার পর্য্যন্ত আলোর ঢেউ পাশাপাশি থাকিতে পারে;—অর্থাৎ ইথারের যে ঢেউগুলি ঐরূপ ছোট ছোট সেইগুলি আলোর

ঢেউ, এবং কেবল সেইগুলি আমাদের চোখে ধাক্কা মারিলে আমরা দেখিতে পাই। আর একটি মজার কথা এই যে এই ঢেউগুলির মধ্যে সাতটি ছোট বড় ঢেউ আছে, এবং উহাদের এক একটি এক এক রংয়ের ঢেউ। পরের প্রবন্ধে এ বিষয় তোমাদের ভাল করিয়া বলিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইথারের যে ঢেউগুলি আলোর ঢেউ অপেক্ষা বড় বা ছোট সেগুলি আমাদের চোখে ধাক্কা দিলেও আমরা দেখিতে পাই না। যেগুলি ঠিক বড় সেগুলি আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাপ উৎপন্ন করে, এবং যেগুলি আরও বড় সেগুলি বেতার-বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যায়—এইগুলি তড়িতের ঢেউ। তড়িতের ঢেউগুলি এক ইঞ্চির কম হইতে তিন চার শত মাইল পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহাদের মধ্যে যেগুলি বেতারের কাজে লাগে সেগুলি সাধারণতঃ আট দশ গজ হইতে দুই এক মাইল পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে। আবার অন্যদিকে দেখ, রঞ্জেন-রশ্মির ঢেউগুলি সাধারণ আলোর ঢেউ অপেক্ষা প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার গুণ ছোট হইতে পারে।

এতক্ষণে শুধু ইথারের ঢেউয়ের ব্যাপার কিছু কিছু শুনিলে ; কিন্তু ইথারের ঢেউ ছাড়াও জল, বাতাস এমন কি মাটি ও পাহাড়ে পর্য্যন্ত যে ঢেউয়ের খেলা চলিতেছে তাহা বোধ হয় তোমরা ভাবিয়া দেখ না। জলের ঢেউত চোখেই দেখিতে পাও। বাতাসের ঢেউ চোখে দেখা যায় না বটে

কিন্তু ইহারাই আমাদের কাণে ধাক্কা মারিলে তবে আমরা শুনিতে পাই। কি করিয়া শব্দের সৃষ্টি হয়, বাতাস কি করিয়া উহাকে বহন করিয়া আমাদের কাণে পৌঁছাইয়া দেয় ও কিরূপে আমরা ঐ শব্দ শুনিতে পাই তাহা পরে বলিব।

আবার দেখ, রাস্তার উপর দিয়া যখন একখানি বড় মোটর-লরী জোরে চলিয়া যায় তখন রাস্তাকে কাঁপাইয়া যে ঢেউ সৃষ্টি করে সেই ঢেউ যে পাশের বাড়ীগুলিকে পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তোলে তাহা সেই সব বাড়ীতে বসিয়া সহজেই বোঝা যায়। ভূমিকম্পের সময় এক জায়গার কাঁপুনি দ্বারা ঢেউ সৃষ্ট হইয়া সেই ঢেউ আশে পাশে অনেক দূরের বাড়ী-ঘর, পাহাড়-পর্ব্বত সব কাঁপাইয়া তোলে তাহা অনেকেই জান। সুতরাং একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে জগতে আমাদের চারিদিকে সর্ব্বদাই নানারকম ঢেউয়ের খেলাই চলিতেছে।

—:০:—

রংয়ের কথা

পুকুরের জলে তুমি যদি একটা খুব ছোট ঢিল ছুড়িয়া ফেল তবে সেখান হইতে ছোট ছোট জলের ঢেউ উঠিবে। একটি বড় ঢিল ফেলিলে ঢেউগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা বড় হইবে। পুকুরের ঢেউয়ের চেয়ে নদীর ঢেউ বড়, আবার সাগরের ঢেউ আরও অনেক বড়। জলের ঢেউ যেমন ছোট বড় অনেক রকম হইতে পারে, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে ইথারের ঢেউও সেইরূপ অতি ছোট ছোট আবার খুব বড় বড় হইতে পারে; এত ছোট হইতে পারে যে মাত্র এক ইঞ্চি জায়গার ভিতর পাঁচ সাত হাজার কোটি ঢেউ পাশাপাশি থাকিতে পারে, আবার বড়গুলি তিন চার শত মাইল লম্বা হইতে পারে—একথা তোমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি এবং ইহাও বলিয়াছি যে ইথারের ছোট বড় অসংখ্য ঢেউগুলির মধ্যে অতি সামান্য কতকগুলি মাত্র আলোর ঢেউ।

সকাল বেলা যখনই সূর্য্য উঠে তখনই চারিদিক আলোকিত হয় আর তখনই আমরা গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট সব দেখিতে পাই। এখানে একটা মজার কথা তোমাদের জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, চারিদিকে আলো হইলে

তোমরা গাছ-পালা সব দেখিতে পাও বটে কিন্তু আলো কি তোমরা দেখিতে পাও ? তোমরা হয়ত বলিবে, "নিশ্চয়ই পাই। আবার কখনও কখনও লাল আলো বা নীল আলোও দেখিতে পাই।" আমি বলিব "ভুল। আলো তোমরা দেখিতে পাও না।" অর্থাৎ যে ইথারের ঢেউ হইতে আলোর উৎপত্তি, সেই ইথার বা তাহার ঢেউ কিছুই দেখা যায় না। আমরা এরূপ প্রায়ই বলি বটে যে "একটি আলো দেখিতে পাইতেছি" অথবা "লাল আলোটি অপেক্ষা নীল আলোটি ভাল", কিন্তু ঐ কথাগুলি ঠিক বলা হয় না ; কারণ আমরা কোন আলো দেখি না, কেবল ঐ আলোর দ্বারা আলোকিত জিনিষগুলি দেখি। লণ্ঠনের আলোর শিখা দেখিতে পাই কারণ লণ্ঠনের তেল যে বাষ্প হইয়া জ্বলে, ঐ বাষ্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তপ্ত কণাগুলি হইতে আলোর ঢেউগুলি ছুটিয়া আসিয়া যখন আমাদের চোখে পড়িয়া ধাক্কা দেয় তখন সেই জ্বলন্ত বাষ্পকণাগুলিকে আমরা দেখিতে পাই এবং তাহাকেই আমরা লণ্ঠনের **আলোর শিখা** বলি ; কিন্তু আলোর ঢেউগুলি আমাদের চোখে ধাক্কা মারিবার পূর্ব্বে আমরা কিছুই দেখি না, সুতরাং আলোও দেখি না। লণ্ঠন জ্বালিলে সেখান হইতে আলোর ঢেউ নিঃসৃত হয় বলিয়া উহাকে স্বতোজ্জ্বল জিনিষ বলে—অর্থাৎ উহা নিজেই আলোক দান করে,—সেইরূপ সূর্য্য, বিজলীবাতি ইত্যাদি স্বতোজ্জ্বল

জিনিষ; কিন্তু চাঁদ, ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা প্রভৃতি এরূপ স্বতোজ্জ্বল নয়, কারণ চাঁদের বা ঘর-বাড়ী ইত্যাদির আলোক দান করিবার কোন ক্ষমতা নাই। তবে উহাদিগকে আমরা কেমন করিয়া দেখিতে পাই বলত?

তোমরা জান যে রবারের বল দেওয়ালের গায়ে জোরে ছুড়িয়া দিলে উহা ঠিক্‌রাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে। নদী বা সাগরের জলের ঢেউ পাড়ের গায়ে ধাক্কা খাইয়া পুনরায় ফিরিয়া যায়। আলোর ঢেউও সেইরূপ সকল জিনিষের গায়ে ধাক্কা খাইয়া ঠিক্‌রাইয়া যায়*। অনেক সময় আয়না লইয়া খেলিতে খেলিতে দেখিয়াছ যে আয়নার উপর সূর্য্যের আলো পড়িলে উহা ধাক্কা খাইয়া ঠিক্‌রাইয়া এদিক ওদিক ছড়াইয়া যায়, এবং আয়না ঘুরাইয়া ঐ আলোকে ইচ্ছামত এদিক ওদিক ঘুরাইতে পারা যায়। সেইরূপ সূর্য্য হইতে বা কোন লণ্ঠন হইতে নিঃসৃত আলোর ঢেউ ঘর-বাড়ী গাছ-পালা বা অন্য কোন জিনিষের উপর পড়িলে এদিক ওদিক ঠিক্‌রাইয়া যায়, এবং যখন যে জিনিষ হইতে ঠিক্‌রানো ঢেউগুলির কতক আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে তখন সেই জিনিষকে আমরা দেখিতে পাই। গাছ-পালা, রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ী এবং ঘরের ভিতরের চেয়ার, টেবিল সবই এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

* লেখক প্রণীত "বিজ্ঞানের নানাকথা"য় ইহা ভাল করিয়া বলা আছে।

তোমরা হয়ত বলিবে, "ঘরের বাহিরের সকল জিনিষের উপর সূর্য্যের আলোর ঢেউ আসিয়া পড়িলে সেই ঢেউ ঠিক্‌রাইয়া চোখে আসিয়া পড়িতে পারে; কিন্তু ঘরের ভিতরের চেয়ার, টেবিল, বই, কাগজ প্রভৃতি যে সকল জিনিষ থাকে তাহাদের উপর ত সূর্য্যের আলো পড়ে না, সুতরাং তাহাদের উপর হইতে কোন আলো ঠিক্‌রাইয়া আমাদের চোখেও আসে না; তবে দিনের বেলা ঘরে আলো না জ্বালিয়া সেগুলি কেমন করিয়া দেখিতে পাই?" ঘরের ভিতর যে সূর্য্যের আলো আসে না এ কথাটি ঠিক নয়। ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আয়নার দ্বারা সূর্য্যরশ্মিকে ঘুরাইয়া সহজেই ঘরের ভিতর ফেলা যায় তাহা তোমরা জান। সেইরূপ সূর্য্যের আলো বরাবর সোজা ঘরের ভিতর আসিয়া না পড়িলেও যখন বাহিরের গাছপালা বা অন্যান্য জিনিষপত্রের উপর আসিয়া পড়ে, তখন ঐ সকল জিনিষ-পত্র আয়নার মত ঐ আলোকে ঘুরাইয়া ঘরের ভিতর পাঠাইয়া দেয়। তবে সব জিনিষ আয়নার মত আলোকে ভাল করিয়া ঘুরাইতে পারে না বলিয়া খুব বেশী আলো সব সময় হয়ত ঘরের ভিতর আসে না। ঐ ঠিক্‌রানো আলো যখন ঘরের জিনিষ পত্রের উপর পড়িয়া পুনরায় ঠিক্‌রাইয়া আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে তখন সেই জিনিষপত্রগুলি আমরা দেখিতে পাই।

তোমরা জান বোধ হয় যে সূর্য্যের আলো চাঁদের উপর

পড়িয়া সেখান হইতে ঠিক্‌রাইয়া যখন পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে তখনই আমরা চাঁদকে দেখিতে পাই; সুতরাং চাঁদের আলো চাঁদের নিজস্ব জিনিষ নয়, উহা সূর্য্যের নিকট হইতে ধার করা জিনিষ। জ্যোৎস্না রাত্রে আমরা বাড়ী-ঘর গাছপালা ইত্যাদি দেখিতে পাই, কারণ চাঁদ হইতে সূর্য্যের ঠিক্‌রানো আলো ঐ সব বাড়ী-ঘর ইত্যাদির উপর পড়িয়া পুনরায় সেখান হইতে ঘুরিয়া আমাদের চোখে আসিয়া ধাক্কা মারে।

কি করিয়া আমরা সব জিনিষপত্র দেখিতে পাই তাহা এতক্ষণে বুঝিলে, কিন্তু নানা জিনিষের লাল, নীল, সবুজ, হল্‌দে, এত নানা রং কোথা হইতে আসে বলিতে পার কি? আবার মজা দেখ, রাত্রিকালে অন্ধকারে কোথাও কোন রংয়ের চিহ্ন নাই, কিন্তু যখনই সূর্য্য উঠিল অমনি চারিদিকে রংয়ের খেলা দেখা গেল—দেখা গেল যে গাছের পাতাটি সবুজ, জবা ফুলটি লাল, আকাশ নীল,—আবার কোনটি বেগুনে, কোনটি হয়ত হল্‌দে ইত্যাদি। শুধু যে গাছপালা বা ফলফুলে নানা রং দেখা যায় তাহা নয়, পশু-পাখী, চেয়ার-টেবিল, বই-খাতা, মাঠ-আকাশ চারিদিকেই যতক্ষণ আলো থাকে ততক্ষণ নানা রংয়ের খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জিনিষের গায়ে এত রং কে মাখাইয়া রাখিয়াছে বল ত?

বৈজ্ঞানিকগণ ইহার গুঢ়রহস্য বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন।

সে রহস্যটি অতি সহজ—বলিতেছি শুন। তোমরা ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক্ নিউটনের নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছ। ১৬৬৮ সালে এই রংয়ের রহস্যের দ্বার তিনিই প্রথম খুলিয়া দেন।* একটি তেশিরা কাচের উপর সূর্য্যের আলো ফেলিয়া তিনি দেখেন যে ঐ আলো যখন কাচের অপর দিক হইতে বাহির হয় তখন সূর্য্যের ঐ সাদা আলো লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, ঘন নীল ও বেগুনে

(ক) হইতে সাদা আলো আসিয়া তেশিরা কাচের (খ) ভিতর দিয়া গিয়া (গ) হইতে ঘ) পর্য্যন্ত সাতটি রংএ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এই সাতটি রংএ ভাঙ্গিয়া যায় (উপরের চিত্র দেখ); অর্থাৎ এই সাতটি রংয়ের আলো একত্রিত করিলে উহারা মিশিয়া আবার সাদা আলো হইয়া যায়। শুধু যে সূর্য্যের

* লেখক প্রণীত "বিজ্ঞান কাহিনী"তে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

আলোর ভিতর এই সাতটি রং আছে তাহা নয় ; প্রদীপের আলো, বিজলী বাতির আলো ইত্যাদি সব সাদা আলোই এইরূপ সাতটি রংয়ের আলো মিশাইয়া তৈরী।

তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আলোর ঢেউগুলির মধ্যে যেগুলি সব চেয়ে বড় সেইরূপ তেত্রিশ হাজার ঢেউ পাশাপাশি রাখিলে তবে এক ইঞ্চি লম্বা হয়। কেবল এই ঢেউগুলি যদি আমাদের চোখে ধাক্কা দেয় তবে আমরা শুধু লাল রং দেখি। যে ঢেউগুলি সব চেয়ে ছোট সেরূপ সাড়ে বাষট্টি হাজার ঢেউ পাশাপাশি রাখিলে তবে এক ইঞ্চি লম্বা হয়। এইগুলি আমাদের চোখে পড়িলে আমরা বেগুনে রং দেখি। যে ঢেউগুলির ধাক্কার দ্বারা লাল রং দেখা যায়—তাহার চেয়ে ঠিক যেগুলি ছোট তাহারা চোখে ধাক্কা দিলে কমলা রং দেখা যায়। এইরূপ লাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেগুনী রংয়ের ঢেউয়ের মধ্যে কমলা, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি আরও পাঁচটি রংয়ের ঢেউ আছে। লাল রংয়ের ঢেউ অপেক্ষা কমলা রংয়ের ঢেউ একটু ছোট, কমলা রংয়ের ঢেউ অপেক্ষা হল্‌দে রংয়ের ঢেউ একটু ছোট, অর্থাৎ লাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেগুনী পর্য্যন্ত প্রত্যেক রংয়ের ঢেউ তাহার পূর্ব্বের রংয়ের ঢেউ অপেক্ষা একটু করিয়া ছোট। সূর্য্যের, প্রদীপের বা বিজলী বাতির সাদা আলোয় এই সাত রংয়ের ঢেউ মিশানো থাকে, এবং তাহারা একসঙ্গে আমাদের চোখে আসিয়া ধাক্কা

দেয় বলিয়া আমরা সাদা আলো দেখি। তেশিরা কাচের ভিতর দিয়া যাইবার সময় সাদা আলোর ছোট বড় ঢেউগুলি সাত ভাগে পৃথক হইয়া যায় সেজন্য সাত রকম রং দেখা যায়। বড় বড় ঝাড় লণ্ঠনে অনেক সময় তেশিরা কাচ ঝুলানো থাকে তাহা দেখিয়া থাকিবে। ঐ সব কাচের উপর রৌদ্র পড়িলে উহার অপর দিকে নানা রকম রঙ্গীন আলো দেখা যায়।

বৃষ্টির পর অনেক সময় আকাশে যে রামধনু দেখ তাহার বিচিত্র রংয়ের ঐ একই কারণ। আকাশে মেঘের ভিতর ছোট ছোট জলবিন্দু ভাসিয়া বেড়ায়। সূর্য্যের আলো ঐ সকল জলবিন্দুর ভিতর দিয়া বাহিরে আসিবার সময় তাহার লাল, নীল ইত্যাদি রংয়ের ঢেউগুলি পৃথক হইয়া যায়; সেজন্য আমরা আকাশের গায়ে ঐরূপ বিচিত্র রং দেখিতে পাই যাহাকে রামধনু বলি।

গাছ-পালা, ফল-ফুল, বাড়ী-ঘর, বই-পেন্‌সিল ইত্যাদি সব জিনিষের নানাবিধ রংয়ের কারণ এখন বুঝিতে আর বোধ হয় কষ্ট নাই। সাদা আলোর ভিতর যে সাত রকম আলো মিশানো থাকে শুধু তাহার জন্যই আমরা জগতের চারিদিকে নানা রংয়ের খেলা দেখি। সূর্য্য উঠিলেই তাহার আলো জবা ফুলটির উপর পড়িয়া ঠিক্‌রাইয়া আমাদের চোখে আসিয়া পড়িল তাই জবা ফুলটিকে দেখিতে পাইলাম। সূর্য্যের আলো যখন ফুলটির উপর পড়িল

উহার সাত রংয়ের ঢেউগুলি সব উহার উপর আসিয়া ধাক্কা মারিল, কিন্তু ফুলটির এমন গুণ আছে যে উহা সাত রংয়ের ঢেউগুলির মধ্যে ছয়টি রংয়ের ঢেউ শুষিয়া লয়, কেবল লাল রংয়ের ঢেউগুলি শুষিতে পারে না। সেজন্য কেবল লাল রংয়ের ঢেউগুলি ফুলটি হইতে ঠিক্‌রাইয়া চোখে আসিতে থাকে এবং এই কারণে জবা ফুলকে লাল দেখায়। সকল রঙ্গীন জিনিষের রংয়ের ঐ একই কারণ। রঙ্গীন জিনিষগুলির প্রত্যেকটি সাদা আলোর কতকগুলি রংয়ের ঢেউ শুষিয়া লইতে পারে বলিয়াই উহারা রঙ্গীন। গাছের পাতা সবুজ, কারণ উহা সবুজ রংয়ের ঢেউ ছাড়া আর সব শুষিয়া লইয়া কেবল ঐটিকে ঠিক্‌রাইয়া আমাদের চোখে ফেলে। কাগজের রং ধব্‌-ধবে সাদা, কারণ উহা কোন রংয়ের ঢেউকেই শুষিতে পারে না; সেই জন্য সব রংয়ের ঢেউগুলি একসঙ্গে আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে বলিয়া আমরা কাগজকে সাদা দেখি। কাল জিনিষগুলির গুণ সাদা জিনিষের ঠিক উল্টা। সাদা জিনিষ কোন রংএর ঢেউ শুষিতে পারে না আর কালো জিনিষ সব রংয়ের ঢেউগুলি শুষিয়া নষ্ট করে, একটিও ঠিক্‌রাইয়া আমাদের চোখে আসে না; সেজন্য উহার কোন রং আমরা দেখি না, এবং যে জিনিষের কোনই রং নাই তাহাকেই আমরা কালো বলি। সত্য কথা বলিতে গেলে সম্পূর্ণ কালো জিনিষ

আমরা দেখিতে পাই না, কারণ যখন কোন রকম আলোই উহার উপর হইতে ঠিক্‌রাইয়া আমাদের চোখে আসে না তখন উহাদের দেখিব কিরূপে ? তবে উহার ঠিক চারি পাশের জিনিষগুলি দেখিতে পাই বলিয়া উহার আকার সম্বন্ধেও আমাদের মনের ভিতর ধারণা হইয়া যায়। সুতরাং কালো জিনিষকে 'দেখি' একথাটা ঠিক নয়। তাহা হইলে দেখ, সাদা বা কালো ইহার কোনটিকেই একটি রং বলা যায় না। সব রং একসঙ্গে মিশিলেই **'সাদা'**, আবার সব রংয়ের অভাব হইলেই উহা **'কালো'**।

চোখের সম্মুখে একখানি লাল কাচ রাখিলে সবই লাল দেখিবে। আমি বলিলাম, লাল কাচ—কিন্তু বল দেখি কথাটি কি ঠিক ? না, কথাটি ঠিক নয়, কারণ কাচটি ত লাল নয় ; শুধু উহার এমন গুণ আছে যে, কেবল লাল রংয়ের ঢেউগুলি উহার ভিতর দিয়া আসিতে পারে, সেজন্য উহাকে লাল বলি, কিন্তু সত্য সত্য কাচটি লাল নয়। যে কাচের ভিতর দিয়া সব আলোর ঢেউ সহজে চলিয়া আসে তাহাকেই সাদা কাচ বলি।

আর একটি মজার ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া দেখ। একটি জবাফুল লণ্ঠনের বা সূর্য্যের সাদা আলোয় দেখিলে উহাকে লাল দেখিবে। এইবার লণ্ঠনের সাদা রংয়ের চিমনী বদ্‌লাইয়া একটি লাল রংয়ের চিমনী পরাও। তাহা হইলে লণ্ঠনের আলো এবার সাদার পরিবর্ত্তে লাল

দেখাইবে এবং ঐ লাল আলোয় জবাফুলটিকেও লাল দেখাইবে। এখন লণ্ঠনের লাল কাচের চিমনী বদ্‌লাইয়া একটি নীল কাচের চিমনী দাও। ঐ নীল আলোয় জবাফুলটির কি রং দেখা যাইবে বল ত? দেখিবে যে এবার ফুলটির কোনই রং নাই; অর্থাৎ উহাকে কালো দেখাইতেছে—কারণ জবাফুল যে লাল ছাড়া আর সব রংয়ের আলো শুযিয়া লয়। যখন কেবল নীল রংয়ের আলোর ভিতর ফুলটিকে রাখিলে তখন ঐ রংটিও ফুলটি শুযিয়া লইল, স্থতরাং কোন আলোই উহার উপর হইতে ঠিক্‌রাইয়া তোমার চোখে আসিল না, সেজন্য উহাকে কালো দেখাইল।

বোধ হয় বুঝিতে পারিলে যে চারিদিকে নানা জিনিষের যে নানাবিধ রং দেখ ইহার কোনটিই উহাদের নিজস্ব নয়। রং একরকম আলো ছাড়া আর কিছুই নয়। যে জিনিষ যে রকম রংয়ের আলো উপর হইতে ঠিক্‌রাইয়া দেয়, অথবা কাচের মত কোন স্বচ্ছ জিনিষের ভিতর দিয়া যে রংয়ের আলো বাহির হইয়া আসে, আমরা সেই সকল জিনিষের গায়ে সেই রং দেখি। সাদা আলোই সব রংয়ের মূল; ইহার ভিতরেই জগতের বিচিত্র রংয়ের খেলার সব উপাদান লুকানো আছে।

—:০:—

আকাশ নীলবর্ণ কেন?

আকাশ যখন পরিষ্কার থাকে তখন তাহাকে দেখিয়া মনে হয় যেন একখানি নীল রংয়ের বড় চাঁদোয়া কেহ ঝুলাইয়া রাখিয়াছে, অথবা নীল রংয়ের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা পাশাপাশি সাজাইয়া ঐরূপ করিয়া রাখা আছে। কিন্তু ইহার কোনটিই ঠিক নহে। সূর্য্যের সাদা আলোই আকাশের নীল রংয়ের কারণ।

নদীর জলে যদি একখানি কাঠ ভাসে তবে জলের খুব ছোট ছোট ঢেউগুলি ঐ কাঠের গায়ে লাগিলে ঠিক্‌রাইয়া ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু খুব বড় বড় ঢেউগুলি উহাকে সহজেই ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবে। সাগরের উপর যখন কোন জাহাজ নোঙ্গর করা থাকে তখন সাগরের ছোট ছোট ঢেউগুলি ঐ জাহাজের গায়ে ধাক্কা খাইলে ফিরিয়া আসে, কিন্তু বড় বড় ঢেউগুলিকে জাহাজখানি কোন বাধা দিতে পারে না, তাহারা সহজেই জাহাজকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়।

আকাশে অতি উচ্চে ছোট ছোট অসংখ্য ধূলিকণা সর্ব্বদা ভাসিতেছে। ইহারা এত ছোট, যে চোখে দেখা ত

দূরের কথা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়াও দেখা যায় না। লাল আলোর ঢেউগুলি কত ছোট তাহা তোমাদের পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই ধূলিকণাগুলি তার চেয়েও ছোট কিন্তু নীল আলোর ঢেউগুলির চেয়ে একটু বড়। সেজন্য সূর্য্যের সাদা আলোর ভিতরের লাল, নীল, হল্‌দে প্রভৃতি ছোট বড় ঢেউগুলির সহিত যখন এই সকল ধূলিকণা ও বায়ুকণার ধাক্কাধাক্কি হয় তখন নীল আলোর ছোট ঢেউগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া যায়। জাহাজ যেমন বড় বড় ঢেউগুলির পথে কোন বাধা দিতে পারে না, কিন্তু ছোট ঢেউগুলিকে বাধা দেয়, তেমনি লাল আলোর বড় ঢেউগুলি ধূলিকণা বা বায়ু-কণার দ্বারা বাধা না পাইয়া বরাবর চলিয়া আসে। এইজন্য সূর্য্যকে আমরা লাল দেখি; আর ঐ ছড়ানো নীল আলোর ঢেউগুলির জন্য উপরের দিকে তাকাইলে আকাশকে নীলবর্ণ দেখি। সুতরাং আকাশে ভাসমান অসংখ্য কণিকাগুলির রং নীল নহে। তাহারা নীল রংয়ের ঢেউ ছড়াইয়া দেয় মাত্র। যদি আকাশে ধূলিকণা বা বায়ু-কণা ইত্যাদি কিছুই না থাকিত তবে আকাশের কোনই রং থাকিত না; অর্থাৎ আকাশের রং কাল দেখা যাইত।

দুপুর বেলা সূর্য্য আমাদের অনেক নিকটে থাকে, কিন্তু সকালে উঠিবার ও সন্ধ্যায় অস্ত যাইবার সময় সূর্য্য অনেক দূরে থাকে, সেজন্য সে সময় সূর্য্যের আলোককে অনেক বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসিতে হয়। সুতরাং সে

সময় আলোর ঢেউয়ের সহিত যে সকল ধূলিকণা ও বায়ুকণার ধাক্কাধাক্কি হয় তাহাদের সংখ্যাও অনেক বেশী। এজন্য সকালে ও সন্ধ্যায় অনেক ধূলিকণা ইত্যাদির সহিত ধাক্কাধাক্কির ফলে অধিক লাল রংয়ের ঢেউ আমাদের কাছে আসে বলিয়া আমরা আকাশকে অধিক লাল দেখি। সকাল অপেক্ষা সন্ধ্যায় আকাশে প্রায়ই ধোঁয়া ও মেঘ থাকে বলিয়া উহাদের দ্বারা ঠিক্‌রানো আলো আরও সুন্দর দেখায়।

— :o:—

দিনের বেলা নক্ষত্র দেখা যায় না কেন ?

সূর্য্য হইতে যত আলো পৃথিবী পর্য্যন্ত আসে তাহার অধিকাংশই বরাবর আমাদের কাছে আসে বলিয়া আমরা সূর্য্যের চেহারা দেখিতে পাই। ঐ আলোর কতক অংশ আকাশের ধূলিকণা ইত্যাদির দ্বারা এদিক ওদিক ছড়াইয়া যায়। ঐ ছড়ানো আলোর জন্যই আকাশকে এত উজ্জ্বল দেখি। যদি আকাশে এমন কিছু না থাকিত যাহা সূর্য্যের আলোকে ছড়াইয়া দেয় তবে আমরা সূর্য্যকে আরও উজ্জ্বল দেখিতাম এবং আকাশকে কাল দেখিতাম। আর তখন দিনের বেলাও নক্ষত্রগুলিকে স্পষ্ট দেখা যাইত। দুপুর বেলা রোদের ভিতর লণ্ঠন রাখিলে তাহার শিখা যেমন দেখা যায় না, তেমনি উজ্জ্বল আকাশের ভিতর দিয়া দিনের বেলায় নক্ষত্রগুলিকে দেখা যায় না।

যদি তোমরা চন্দ্রলোকে যাও তবে সেখান হইতে দিনের বেলাও নক্ষত্র বেশ দেখিতে পাইবে; কারণ সেখানে বাতাস নাই বলিয়া উপরে ধূলিকণা ইত্যাদি কিছুই ভাসিয়া

বেড়াইতে পারিবে না, এবং ধূলিকণা বা বায়ুকণা কিছুই না থাকাতে সূর্য্যের আলো সব সোজাসুজি চন্দ্রের উপর আসিয়া পড়িবে, কিছুই এদিক ওদিক ছড়াইয়া যাইবে না। সুতরাং আকাশের রং ঘোর কাল দেখা যাইবে, এবং ঐ কাল রংয়ের আকাশের ভিতর নক্ষত্রগুলিকে বেশ উজ্জ্বল দেখাইবে।

—:o:—

জলে ভাসা তেলের গায়ে বিচিত্র রং দেখা যায় কেন?

তোমরা অনেক সময় দেখিয়া থাকিবে যে জলের উপর সামান্য এক ফোঁটা তেল ফেলিলে উহার উপর সূর্য্যের আলো পড়িয়া লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিচিত্র রংয়ের বিকাশ দেখায়। ইহার কারণ এই যে, জলের উপর তেল পড়িলেই উহা তখনই অনেকটা জায়গার উপর ছড়াইয়া তেলের একটি পাতলা পর্দ্দা পড়িয়া যায়। তেলের এই পর্দ্দাটি এত পাতলা হয় যে, সাধারণ মাপকাটি দিয়া তাহা মাপিবার উপায় নাই। আলোর ঢেউগুলি কত ক্ষুদ্র তাহা

তোমরা জান। সামান্য এক ইঞ্চি জায়গার ভিতর পঞ্চাশ ষাট হাজার আলোর ঢেউ থাকে। তেলের পর্দ্দা প্রায় সেইরূপ পাতলা হয়। যখন সূর্য্যের সাদা আলোর ঢেউ ঐ পাতলা পর্দ্দার উপর পড়ে তখন তাহার কতকগুলি ঢেউ তেলের পর্দ্দার উপর ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসে, আবার কতকগুলি ঐ পর্দ্দা ভেদ করিয়া জলের পিঠে পড়িয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। এইরূপে ঢেউগুলি সব এক সঙ্গে না থাকিয়া আগাইয়া পিছাইয়া যায়। লাল আলোর ঢেউগুলি বড় বলিয়া হয়ত তেলের পর্দ্দা হইতে ফিরিয়া আসে। আবার নীল আলোর ঢেউ হয়ত জলের পিঠ হইতে ফিরিয়া আসে।

জলের ঢেউয়ের বেলা অনেক সময় দেখা যায় যে, যখন একটা ঢেউয়ের উপর আর একটা ঢেউ পড়িয়া পরস্পর কাটাকাটি করিয়া নষ্ট হইয়া যায় তখন সেখানে কোন ঢেউ থাকে না। সেইরূপ আলোর একই রংয়ের একটা ঢেউ আর একটা ঢেউয়ের দ্বারা উল্টা দিকে ধাক্কা খাইয়া উভয়েই লোপ পাইয়া যায়। সাদা রংয়ের ঢেউয়ের ভিতর হইতে এইরূপে লাল, নীল বা যে কোন রংয়ের ঢেউ লোপ পাইলে যাহা বাকি থাকে তাহা আর সাদা থাকিতে পারে না, রঙ্গীন হইয়া যায়। সূর্য্যের আলো তেলের পর্দ্দার উপর পড়িবার পূর্ব্বে সব ঢেউ এক সঙ্গে মিশিয়া সাদা থাকে, কিন্তু ফিরিবার সময় দল ভাঙ্গিয়া

আগাইয়া পিছাইয়া বা দলের দুই একটি নষ্ট হইয়া যায়; সেজন্য বাকি যাহা আমাদের চোখে আসে তাহা রঙ্গীন দেখায়।

সাবানের ফেনার রং, ঝিনুকের গায়ের রং ইত্যাদি যে সব রংয়ের খেলা দেখ উহারা ঐ একই কারণে উৎপন্ন হয়।

—:o:—

শব্দের কথা

মনে কর এক দিন রাত্রে তুমি ঘুমাইয়া আছ এমন সময় কেহ তোমাকে পৃথিবী হইতে উড়াইয়া লইয়া গিয়া চন্দ্রে রাখিয়া আসিল, এবং চন্দ্রে আদৌ বাতাস নাই বলিয়া যাহাতে তুমি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পার সেজন্য একটা বড় থলি বাতাসে ভরিয়া তোমার নাকের নিকট রাখিয়া দিল। ঘুম ভাঙ্গিবার পর তোমার কি অবস্থা হইবে বলত? নূতন জায়গা দেখিয়া হয়ত তুমি ভয়ে চীৎকার করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু দেখিবে যে তুমি যতই কথা বলিতে যাও, যতই চীৎকার করিতে চেষ্টা কর কিছুমাত্র স্বর বাহির হইতেছে না। মুখের স্বর

বাহির হইতেছে না বলিয়া জোরে হাততালি দিলে কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র শব্দ হইল না। তুমি ভাবিলে, "এ কি হইল? সত্য সত্যই এদেশে কি কোনই শব্দ হয় না, অথবা আমি এখানে আসিয়া বোবা বা কালা হইয়া গেলাম।"

কিন্তু সত্য ব্যাপারটা কি জান? তুমি বোবা বা কালা কিছুই নও। চন্দ্রে বাতাস নাই বলিয়া সেখানে কোন শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না; কারণ বাতাসের কাঁপুনি দ্বারাই শব্দ সৃষ্ট হয়। কি করিয়া শব্দ উৎপন্ন হয়, কি করিয়া উহা আমরা শুনিতে পাই, ও কি উপায়ে উহা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় চলিয়া যাইতে পারে এইবার সেই কথা তোমাদের বলিব।

তোমাদের স্কুল বসিবার সময় বা স্কুলের ছুটি হইবার সময় পেটা ঘড়ির গায়ে মুগুরের ঘা মারিয়া যখন ঢং ঢং করিয়া আওয়াজ করে, তখন সেই ঘড়িটার গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে ঘড়িটি কাঁপিতেছে।

একটা কাঁসার গেলাসের গায়ে পেন্‌সিল বা অন্য কিছু দিয়া ঘা মারিলেই শুনিবে যে আওয়াজ বাহির হইতেছে। তখন গেলাসের কিনারায় হাত দিলেই বেশ বুঝিতে পারিবে যে উহা কাঁপিতেছে। যদি খুব হাল্‌কা শোলা দিয়া ছোট মার্ব্বেলের মত গোল একটি বল করিয়া সূতা দিয়া ঝুলাইয়া ঐ গেলাসের কিনারায় ছোঁয়াইয়া দাও, তবে দেখিবে

যে শোলার বলটি যখনই গেলাসের কিনারা ছুঁইবে তখনই ধাক্কা খাইয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইবে। আবার ফিরিয়া আসিয়া ছুঁইবে, আবার ছুটিয়া যাইবে এইরূপে বলটি নাচিতে থাকিবে (১নং চিত্র দেখ)। ইহাতেও ভাল করিয়া বুঝা যাইবে যে গলাসটি কাঁপিতেছে। যখন গেলাস স্থির থাকে তখন সে কোন আওয়াজ দিতে পারে না এবং তখন তাহার গায়ে শোলার বল ছোঁয়াইয়া রাখিলে বলটিও নাচেনা। এ পরীক্ষাটি তোমরা নিজে করিয়া দেখিতে পার।
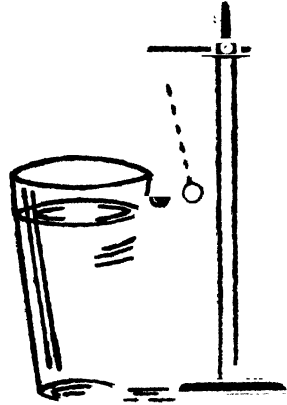
১নং চিত্র
গেলাসটি কাঁপিতেছে ও তাহার গায়ে শোলার বল ধাক্কা খাইয়া নাচিতেছে।

যখন গেলাসটি বা পেটা ঘড়িটা আওয়াজ দেয় তখন যদি গায়ে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া উহাদের কাঁপুনি বন্ধ করিয়া দাও তবে তখনই আওয়াজ বন্ধ হইয়া যাইবে।

তাহা হইলে ইহা বুঝিতে পারিলে যে কোন জিনিষ হইতে শব্দ উৎপন্ন করিতে হইলে তাহাকে কাঁপাইতে হইবে এবং কাঁপুনি থামিলে শব্দও থামিয়া যাইবে।

তোমরা হয়ত বলিবে, "যদি জিনিষ কাঁপিলেই শব্দ উৎপন্ন হয় তবে একটা পেন্‌সিলকে বা একটা ছড়িকে ধীরে ধীরে দুই চারিবার এদিক ওদিক নাড়াইলে কোন শব্দ উৎপন্ন হয় না কেন?" তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা কতকটা ঠিক বটে, কিন্তু ছড়িটিকে আরও জোরে নাড়াইয়া বা ঘুরাইয়া দেখ, তখন শব্দ শুনিতে পাইবে, সুতরাং প্রথমে যে শব্দ শুনিতে পাও নাই তাহা কাণের দোষের জন্য। ছড়ি ধীরে ধীরে ঘুরাইলেও শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল কিন্তু তোমাদের কাণ অত মৃদু শব্দ শুনিতে পায় নাই সেজন্য তোমরা বলিতেছ যে শব্দ উৎপন্ন হয় নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আমাদের কাণের একটু দোষ আছে। ইহা খুব মৃদু শব্দ অথবা খুব জোর শব্দ শুনিতে পায় না। যে সব জিনিষ এক সেকেণ্ডে ত্রিশ চল্লিশ বারের কম কাঁপে তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন শব্দ আমরা শুনিতে পাই না, আবার কোন জিনিষ সেকেণ্ডে ত্রিশ চল্লিশ হাজার বারের অধিক কাঁপিলেও সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। বাঁশী বাজাইবার সময় হাওয়া জোরে দিলে স্বরও জোরে বাহির হয়। কিন্তু ক্রমশঃ হাওয়ার জোর খুব বেশী করিলে শেষে স্বর অস্পষ্ট হইয়া যায়। তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিও যে কখনও কখনও রেলের বাঁশী যখন খুব জোরে বাজায় তখন উহা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসে।

কাঁপুনি দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা তোমরা বুঝিতে পারিলে বটে, কিন্তু কি করিয়া ঐ শব্দ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায় তাহাও জানা দরকার। স্কুলের ফটকের কাছে চাকরটা যখন ঘড়ি বাজাইল সেই আওয়াজটি তখনই কাহার দ্বারা ও কি উপায়ে স্কুলের সকল ঘরে প্রত্যেক লোকের নিকট পৌঁছিল ; এক মাইল দূরে বন্দুক ছুটিল, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে আওয়াজ কি রকমে তোমার কাণে পৌঁছিল, এইবার সেই ব্যাপারটা বুঝিতে হইবে।

জলের ঢেউয়ের দৃষ্টান্ত তোমরা সকলেই জান। পুকুরের স্থির জলে যদি একটা ঢিল ফেল তবে সেখানকার জল খানিকটা নীচু হইয়া যায়। এক রাশ ময়দা, বালি অথবা কাদার ভিতর ঢিল ফেলিলে যেখানে ঢিল পড়ে সেখানকার খানিকটা ময়দা, বালি বা কাদা সরিয়া একটা গর্ত্ত হইয়া যায় এবং সে গর্ত্ত সেইরূপ থাকিয়াই যায় ; কিন্তু জলের ভিতর ঢিল ফেলিলে যে গর্ত্ত হয় তাহা সেই অবস্থায় থাকিতে পারে না, কারণ সেখানকার জল পুনরায় ঠেলিয়া উপরে ওঠে, আবার নীচে নামে ; এইরূপ একবার উপর ও একবার নীচু এইভাবে নাচিতে থাকে। একটা স্প্রীংয়ের খাটের উপর তুমি যদি ধপ্ করিয়া শুইয়া পড় তবে খাটের স্প্রীং যেমন তোমাকে কিছুক্ষণ একবার উঁচু ও একবার নীচু করিয়া নাচাইতে থাকে, জলের এক জায়গায় ঢিল ফেলিয়া বা অন্য কোনরূপে নাড়াইয়া দিলেও উহা অনেকটা

ঐ প্রকার নাচিতে থাকে, এবং সেই জায়গার জলের উঁচু নীচু হইয়া নাচিবার সময় পাশের জলও ধাক্কা পাইয়া ঐরূপ নাচিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে যে জায়গার জল নাড়া পায় সেখান হইতে গোল গোল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। সেই ঢেউগুলি ক্রমশঃ বড় হইয়া অবশেষে পুকুরের পাড়ে গিয়া ধাক্কা দেয়।

পুকুরের জলে ঢিল ফেলিয়া এইরূপ ঢেউ তোমরা অনেক সময় দেখিয়াছ। ঢেউগুলি যখন এক জায়গা হইতে যাত্রা করিয়া অনেক দূরে চলিয়া যায় বা পুকুরের পাড়ে আসিয়া পৌঁছে, তোমরা বোধ হয় মনে কর যে যেখানে ঢিল ফেলিয়াছ সেখান হইতে জলকণাগুলি ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু তাহা ঠিক নয়। যেখানে ঢিল ফেলিয়া জল নাড়াইয়া দেওয়া যায় সেখানকার জলকণাগুলি সেখানেই উঁচু নীচু হইয়া নাচিতে থাকে এবং ক্রমে তাহার চারিপাশের জলকণাগুলিও ঐরূপ নাচিতে আরম্ভ করে। এই নাচুনি বা কাঁপুনির ফলেই ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। শুধু এই ঢেউগুলিই ক্রমে দূরে চলিয়া যায়, জলকণাগুলি নয়। এক জায়গার জল আর এক জায়গায় যায় না। সেজন্য জলের এইরূপ ঢেউয়ের উপর পাতা, কাগজ বা ঐরূপ কোন হাল্কা জিনিষ ফেলিয়া দেখিও যে উহা জলের সহিত একই জায়গায় উঁচু নীচু হইয়া নাচিতে থাকিবে, ঢেউয়ের সহিত দূরে চলিয়া যাইবে না।

এইবার শব্দ কি করিয়া উৎপন্ন হইয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যায় তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে। ঢিল ফেলিয়া জলকে নাড়াইলে যেমন ঢেউ সৃষ্ট হয় এবং ঐ ঢেউ ক্রমে দূরে চলিয়া যায়, সেইরূপ যে বাতাস আমাদের চারিদিকে সব জায়গা জুড়িয়া আছে তাহাকে কোথাও কাঁপাইয়া দিলে সেখান হইতে অসংখ্য বাতাসের ঢেউ উৎপন্ন হইয়া উহারা ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যায়। স্কুলের পেটা ঘড়ির গায়ে মুগুরের ঘা মারিলে ঘড়িটি যে কাঁপে তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ কাঁপুনির জন্য ঘড়িটির চারিদিকে বাতাসে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় এবং ঐ ঢেউগুলি চারিদিকে ছুটিতে থাকে। ২নং চিত্রে দেখ একটি ঘণ্টা
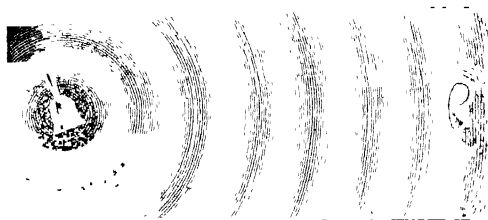
২নং চিত্র

বাতাসের ঢেউ ছুটিয়া কাণের পর্দ্দার উপর পড়িতেছে।

বাজাইয়া যে বাতাসের ঢেউ সৃষ্ট হইয়াছে তাহারা কেমন করিয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্য করিয়া দেখ যে বাতাসের ঢেউগুলি জলের ঢেউয়ের মত উঁচু

নীচু নয়। পিতলের বা লোহার একটি লম্বা সরু স্প্রীংকে ঝুলাইয়া রাখিয়া নাড়াইয়া দিলে উহা যেমন নাচিতে আরম্ভ করে এবং নাচিবার সময় স্প্রীংয়ের তারগুলি একসময় এক জায়গায় জড় হইয়া পরক্ষণেই আবার ফাঁক হইয়া যায়, কোন জিনিষ কাঁপিবার সময় উহার ধাক্কায় চারিধারের বায়ুকণাগুলি ঐরূপ এক সময় এক জায়গায় জড় হইয়া আবার পরক্ষণে ফাঁক হইয়া পড়ে ও বারবার এইরূপে কাঁপিতে থাকে। ঐ বায়ুকণাগুলি আবার উহাদের পাশের কণাগুলিকে কাঁপাইয়া দেয়, এবং এই রকমে বাতাসের ঢেউ এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ছুটিয়া চলে। এই ঢেউগুলি আমাদের কাণের উপর পড়িলে উহারা কাণের ভিতরে যে একটি পাতলা পর্দ্দা আছে সেটাকে কাঁপাইয়া দেয়, আর তখনই ভিতরের স্নায়ুগুলি ঐ কাঁপুনির খবর মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেয় এবং তবে আমরা শুনিতে পাই।

পূর্ব্বেই তোমাদের বলিয়াছি যে জলের ঢেউ যখন এক-স্থান হইতে অন্যস্থানে যায় তখন জলকণাগুলি যেমন ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে যায় না, সেইরূপ বায়ুকণাগুলিও বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলে না। সুতরাং যখন তোমা-দের স্কুলের ফটকের কাছে ঘড়ি বাজিল এবং ঘরে বসিয়া তুমি ঐ আওয়াজ শুনিতে পাইলে, তখন যেন মনে করিও না যে ঘড়ির গায়ে ঘা দেওয়ার জন্য সেখান হইতে বাতাসের

কণাগুলি ছুটিয়া আসিয়া তোমার কাণের উপর আঘাত করিয়াছে বলিয়া তুমি শুনিতে পাইয়াছ। তাহা যদি হইত তবে নিশ্চয়ই কাণের উপর ঐ আঘাতের চাপ বোধ করিতে; এবং বন্দুক বা কামান ইত্যাদির জোর আওয়াজ শুনিবার সময় কাণের উপর আরও অধিক চাপ বোধ করিতে। কিন্তু সত্যসত্যই আমরা মৃদু বা জোর কোন আওয়াজই শুনিবার সময় কাণের উপর কোন চাপ বোধ করি না। সুতরাং পেটা ঘড়ি বা কাঁসার গেলাসের গায়ে আঘাত করিলে, পুরোহিত ঠাকুর পূজার ঘণ্টা নাড়িলে, টেবিলের উপর চড় মারিলে, রাস্তায় গাড়ী টানিলে, অথবা দূরে বন্দুক ছুড়িলে, যেখান হইতে যে শব্দ শুনিতে পাও না কেন, সবই বাতাসের ঢেউ বহিয়া আনিয়া তোমার কাণে পৌঁছাইয়া দেয়। তাহা হইলে বুঝিতে পারিলে যে শব্দের ব্যাপারে মোটামুটি তিনটি জিনিষের দরকার :—(১) যাহা শব্দ উৎপন্ন করে তাহার কাঁপুনি, যেমন পেটা ঘড়ি; (২) যাহা শব্দ গ্রহণ করে তাহার কাঁপুনি,—যেমন আমাদের কাণের পর্দ্দা; (৩) আর যাহা শব্দ বহন করিয়া আনে,—যেমন বাতাস।

আমরা যখন কথা বলি তখন ফুস্‌ফুস হইতে বাতাস টানিয়া লইবার সময় আমাদের গলার ভিতর যে দুইটি পাতলা পর্দ্দা আছে উহারা কাঁপে এবং ঐ কাঁপুনি দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয়। ঐ পর্দ্দা দুইটিকে ইচ্ছামত কড়া বা ঢিলা

করিলে উহাদের কাঁপুনির দ্বারা জোরে বা আস্তে স্বর বাহির হয়। অবশ্য পর্দ্দাদুইটিকে কড়া বা ঢিলা করিবার জন্য আমাদের বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে হয় না। গলার ভিতরের মাংশপেশীর দ্বারা ঐ কাজ আপনি আপনি হইয়া যায়। পুরুষ মানুষের গলার ভিতরের পর্দ্দাদু'টি স্ত্রীলোকের এবং বালকদিগের পর্দ্দা অপেক্ষা বড় ও মোটা বলিয়া একটু কম কাঁপে। সেজন্য পুরুষ মানুষের গলার স্বর স্ত্রীলোক বা বালকের স্বর অপেক্ষা মোটা। তোমরা বেহালা, বাঁশী, হারমোনিয়ম প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রাদির যে সুমিষ্ট স্বর শুনিতে পাও, কাঁপুনিই সে সকলের মূল। বেহালার উপর ছড় চালাইলে উহার তার কাঁপে, বাঁশীতে ফু দিলে উহার ভিতরের আবদ্ধ বাতাস কাঁপে, এবং হারমোনিয়মে হাওয়া দিলে উহার ভিতরে যে পিতলের পাতলা রিড্ বসান আছে তাহারা কাঁপে। যে গ্রামোফোনকে তোমরা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে কর তাহার আসল ব্যাপারটি কিন্তু খুব সহজ; এবং তাহার মূলেও ঐ কাঁপুনি। গান শুনিবার সময় গ্রামোফোনের যে চোঙ্গ দেখিয়াছ, রেকর্ড তৈরী করিবার সময় ঐরূপ একটি চোঙ্গ (F) লওয়া হয় (৩নং চিত্র দেখ)। ঐ চোঙ্গের সরু দিক্‌টায় একটি পাতলা পর্দ্দা (D) লাগান থাকে এবং ঐ পর্দ্দার নীচে ষ্টিলের একটি ছোট সূচ (S) আট্‌কানো থাকে। ঐ চোঙ্গের সম্মুখে কথা বলিলে বা গান করিলে উহার ভিতরের বাতাসে যে ঢেউ

সৃষ্ট হয় তাহা পর্দ্দাটিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সূচটিকেও কাঁপায়। সূচটিকে ছোঁয়াইয়া উহার নীচে একটি মোমের চাকতি (C) ঘুরাইলে, সূচটি কাঁপিবার সময় ঐ চাকতির উপর আঁকা-বাঁকা দাগ বসাইয়া দেয়। ইহাই রেকর্ড তৈরী করিবার মোটামুটি ব্যাপার। একখানি রেকর্ড লইয়া খুব ভাল করিয়া দেখিলে উহার উপর এইরূপ আঁকা-বাঁকা দাগ দেখিতে পাইবে। রেকর্ড হইতে গান শুনিবার সময় উহার সেই আঁকা-বাঁকা দাগের উপর দিয়া সাউণ্ড-বক্সে লাগানো সূচটি চলিতে চলিতে সাউণ্ড বক্সের ভিতরের পর্দ্দাকে কাঁপায়। পর্দ্দার কাঁপুনি বাতাসে ছোট বড় অসংখ্য ঢেউ উৎপন্ন করে এবং তাহারা আমাদের কাণে পড়িলে নানারূপ স্বর শুনা যায়।
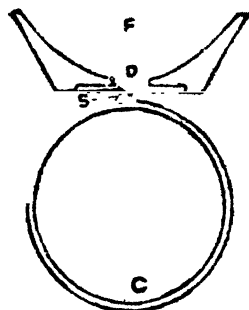
৩নং চিত্র।
গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈরী করিবার কৌশল।

তোমরা বলিতে পার, "বাতাস আমরা দেখিতে পাইনা, তাহার ঢেউও দেখিতে পাইনা ; সুতরাং সত্যসত্যই বাতাস না থাকিলে যে আমরা শব্দ শুনিতে পাইনা ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব।" একটি পরীক্ষা দ্বারা ইহা সহজে বুঝান যায়। ৪নং চিত্রে দেখ যে একটি ইলেক্ট্রিক ঘণ্টা একটি বড় কাচের বোতলের ভিতর রাখা আছে। বোতলটি যে

থালার উপর বসান আছে, উহার নীচে একটি ছিদ্র আছে এবং ঐ ছিদ্রের সহিত একটি নল সংযুক্ত আছে। ইলেক্ট্রিক ঘণ্টা চালাইয়া দিলে প্রথমে বেশ জোরে আওয়াজ শুনিতে পাইবে। এখন ঐ
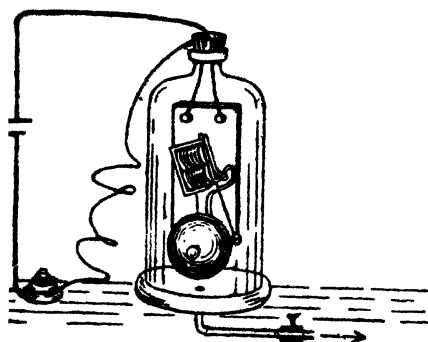
৪নং চিত্র।

বোতলের ভিতর ইলেক্ট্রিক ঘণ্টা বাজিতেছে।

নলের সহিত পাম্প লাগাইয়া বোতলের ভিতর হইতে বাতাস বাহির করিতে থাকিলে আওয়াজ ক্রমেই কমিয়া আসিবে, এবং এইরূপে সব বাতাস বাহির করিয়া ফেলিলে ঘণ্টা হইতে বোতলের গা পর্য্যন্ত শব্দ বহিয়া আনিবার কিছুই থাকিবে না, সুতরাং কোনই আওয়াজ শুনিতে পাইবে না— যদিও দেখিতে পাইবে যে ঘণ্টার মুগুরটি বাটির গায়ে ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় আঘাত করিতেছে। এইবার পাম্প খুলিয়া ভিতরে বাতাস ঢুকাইয়া দিলে পুনরায় আওয়াজ শুনিতে

পাইবে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে বাতাসই শব্দকে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় বহিয়া লইয়া অবশেষে আমাদের কাণে পৌঁছাইয়া দেয়। এইজন্য চন্দ্রে গিয়া তুমি যতই মুখ নাড়াও ও চীৎকার করিতে চেষ্টা কর কোনই শব্দ শুনা যাইবে না,—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যদিও সাধারণতঃ বাতাসই শব্দকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যায়; কিন্তু বাতাস ছাড়াও জল, লোহা, কাঠ, পাথর প্রভৃতি সব জিনিষের ভিতর দিয়া শব্দের ঢেউ যাইতে পারে। পুকুরে স্নান করিবার সময় জলে ডুব দিয়া উপরের শব্দ শুনিতে পাইবে, আবার জলের ভিতর অন্য কেহ যদি কোন শব্দ করে তাহাও শুনিতে পাইবে। যদি খুব লম্বা একটা লোহার নলের একদিকে তুমি কাণ দিয়া থাক এবং অন্য কাহাকেও নলের অপর দিকে ঘা দিতে বল তবে তুমি দুইটি শব্দ শুনিতে পাইবে—একটি লোহার ভিতর দিয়া আসিয়াছে, অপরটি নলের ভিতরের বাতাস দিয়া আসিয়াছে। দুইটি শব্দের মধ্যে আগেরটি লোহার ভিতর দিয়া আসিয়াছে। শব্দ বাতাসের ভিতর দিয়া যত জোরে যায় জলের ভিতর দিয়া তার চেয়ে বেশী জোরে যায় এবং লোহার ভিতর আরও জোরে যায়। শব্দ বাতাসের ভিতর দিয়া এক মাইল দূর যাইতে প্রায় সাড়ে চার সেকেণ্ড সময় লাগে; অর্থাৎ এক ঘণ্টায় প্রায় আটশত মাইল দূরে যায়, কিন্তু লোহার ভিতর প্রায় ইহার দশগুণ জোরে যায়।

সেজন্য যখন রেল ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া ট্রেণের জন্য অপেক্ষা কর, তখন রেল লাইনের উপর কাণ দিয়া থাকিলে ট্রেণের শব্দ অন্য কেহ শুনিবার অনেক আগেই তুমি শুনিতে পাইবে।

শব্দ যতই জোরে যাক্. আলোর গতির সহিত ইহার তুলনাই হয় না। শব্দ এক মাইল দূরে যাইতে না যাইতে আলো লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে চলিয়া যায়। এই জন্য যখন রেলের বা ষ্টীমারের বাঁশী বাজে তখন দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিও বাঁশী বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীর কল হইতে যে ধোঁয়া বাহির হয়. শব্দ শুনিবার কিছু আগেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। আলো ও শব্দ একই সময়ে যাত্রা স্থরু করে, কিন্তু ধোঁয়া বাঁশীর চোঙ্গ হইতে যখন বাহির হয়, প্রায় সেই মুহূর্ত্তেই ঐ আলো আমাদের চোখে পোঁছিয়া সেই ধোঁয়াকে দেখায়; কিন্তু শব্দ পোঁছিতে একটু দেরী হয়, সেজন্য উহা কিছু পরে শুনিতে পাই। খুব বড় মাঠের এক ধার হইতে যদি কেহ বন্দুক ছোড়ে তবে অন্য ধার হইতে শব্দ শুনিবার অনেক আগেই আগুনের ফুল্‌কি দেখা যাইবে। মাঠের একধারে দাঁড়াইয়া কেহ জোরে হাততালি দিলে অন্য ধার হইতে উহার শব্দ শুনিবার আগেই হাতে হাত লাগা দেখিতে পাইবে। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিও।

একটা কথা তোমাদের মনে উঠিতে পারে—তোমরা ভাবিতে পার, 'বাতাসই যদি শব্দকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহিয়া লইয়া যায় তবে আস্তে কথা বলিলে বা

আস্তে অন্য কোন শব্দ করিলে উহা সামান্য দূর হইতে শুনা যায় না কেন? জোরে কথা বলিলে কিছু বেশী দূর হইতে শুনা যায়, আবার বন্দুকের আওয়াজ অনেক দূর হইতে শুনা যায়। এমন হয় কেন? বাতাস ত সর্ব্বত্রই আছে তবে মৃদু শব্দ বেশী দূরে যায় না কেন?' পুনরায় পুকুরে ঢিল ফেলার দৃষ্টান্ত লইলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবে। পুকুরে যদি একটা খুব ছোট ঢিল ফেল তবে সেখান হইতে জলের ঢেউ কিছু দূরে যাইতে না যাইতে মিলাইয়া যাইবে, কিন্তু বড় ঢিল ফেলিলে সেবার ঢেউ অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইবে, হয়ত পুকুরের কিনারা পর্য্যন্ত পৌঁছিবে। ঢিল আরও বড় হইলে খুব বড় বড় ঢেউগুলি হয় ত কিনারায় গিয়া ধাক্কা লাগাইবে। শব্দের বেলাও ঠিক ঐরূপ হয়। তুমি যদি মৃদু আওয়াজ কর তবে সেখান হইতে ছোট ছোট বাতাসের ঢেউগুলি বেশী দূর যাইবার আগেই মিলাইয়া যাইবে। যদি আওয়াজ জোরে হয় তবে ঢেউ বেশী দূর যাইতে পারিবে—অর্থাৎ দূর হইতে উহা শুনা যাইবে।

আর একটি কথা বলিয়া শব্দের বিষয় শেষ করিব। বোধ হয় অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছ যে কোন বড় বাড়ীর ধারে, পাহাড়ের কাছে বা জঙ্গলের ধারে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিলে বা জোরে হাততালি দিলে পুনরায় একটু পরেই ঐ চীৎকারের বা হাততালির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে 'প্রতিধ্বনি' বলে। ইহা কেন হয় বলিতেছি

শুন। রবারের বল দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খাইলে ঠিক্‌রাইয়া ফিরিয়া আসে। পুকুরের জলে যখন বড় বড় ঢেউ উঠে তখন সেই ঢেউ পাড়ে ধাক্কা খাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে। আলোর ঢেউ আয়নার উপর পড়িয়া ঠিক্‌রাইয়া ফিরিয়া যায়। সেইরূপ শব্দের অর্থাৎ বাতাসের ঢেউ দেওয়াল, গাছপালা বা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে : সেজন্য সেই একই শব্দ আর দুই একবার শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন বড় হল-ঘরে কথা বলিলে গম্ গম্ করিয়া আওয়াজ হয় সেজন্য অন্য লোকে সে কথা ভাল বুঝিতে পারে না। ইহার ঐ একই কারণ। জোরে কথা বলিলে শব্দের ঢেউগুলি এক দেওয়াল হইতে অন্য দেওয়ালের গায়ে বারে বারে ধাক্কা খাইতে থাকে, সেজন্য প্রতিধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় না, কেবল গম্ গম্ করিয়া একটা গোলমেলে আওয়াজ হয়। এই কারণে এই সব হল-ঘরে বক্তৃতা হইবার সময় চারিদিকের দেওয়ালে পর্দ্দা ইত্যাদি ঝুলাইয়া দিলে, অথবা ঘরের ভিতর অনেক লোক থাকিলে ঐরূপ গোলমাল অনেক কম হয় ; কারণ রবারের বল বালির উপর পড়িলে যেমন আর ফিরিয়া আসে না সেইরূপ বাতাসের ঢেউ কাপড় চোপড়ের ন্যায় নরম জিনিষের উপর পড়িলে আর ফিরিয়া আসিতে পারে না ; সেজন্য ঐরূপ গোলমাল অনেক থামিয়া যায়।

—:*:—

গাছপালার সহিত মানুষের সম্বন্ধ

তোমরা বোধ হয় ভাব যে পৃথিবীতে গাছপালা না থাকিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইত না। গাছপালা আমাদের উপকার করে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া গাছপালা ভিন্ন আমাদের চলিতই না ইহা বোধ হয় তোমরা স্বীকার কর না।

আচ্ছা, ভাবিয়া দেখ ত গাছপালা ভিন্ন আমাদের চলিত কিনা। প্রথমে গাছপালা আমাদের কি কি খাদ্য সরবরাহ করে তাহা দেখ; আম, জাম, কাঁঠাল, বেল, নারিকেল, কলা ইত্যাদি ফলকে আমরা খাই; আলু, বেগুন, লাউ, কুমড়া, ওল, কপি ইত্যাদিকেও তরকারীরূপে খাই; আবার ধান, গম ইত্যাদি ত আমাদের প্রধান খাদ্য। আবার খাদ্য ছাড়া অন্য দিকে জুঁই, গোলাপ, মল্লিকা ইত্যাদি ফুল-গাছগুলি পৃথিবীর শোভা বাড়ায়; শাল, সেগুন, শিশু ইত্যাদি গাছের তক্তা হইতে আমাদের বাস ঘরের দরজা-জানালা হয়, চেয়ার-টেবিল, খাট-পালং ইত্যাদি ঘরের আস্‌বাব তৈরী হয়, এবং নৌকা, গাড়ী ইত্যাদি যানও প্রস্তুত হয়। পাট, তুলা প্রভৃতি গাছ হইতে দড়ি ও কাপড়-চোপড়

তৈরী হয়। আবার গাছগাছড়া হইতে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া মুগ, মুশুরী ইত্যাদি নানাবিধ ডাউল; লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ ইত্যাদি মশ্লা; সরিষার তেল, নারিকেলের তেল, রেড়ীর তেল ইত্যাদি নানারকম তেল; আবার চা, কফি, কোকো ইত্যাদি যাহা সব গাছ-গাছড়া হইতে পাওয়া যায় তাহাও আমাদের কাজে লাগে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের খাওয়া, পরা, ঔষধ, বাসস্থান, যাতায়াত ইত্যাদি সকল কাজেই গাছ-পালার দরকার। কিন্তু সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের খাদ্যের কথাই প্রথমে ধরা যাক্, কারণ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য খাদ্যই সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। ভাবিয়া দেখ যে খাদ্যের জন্য গাছ-গাছড়ার নিকট আমরা কি পরিমাণে ঋণী। তোমরা হয়ত বলিবে, "যদিও অধিকাংশ খাদ্য আমরা গাছগাছড়া হইতে পাই, তথাপি ফল, মূল, তরকারী ইত্যাদি না থাকিলে আমরা মাছ, মাংস, ছানা, দুধ, দই ইত্যাদি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতাম।" কিন্তু মাছ-মাংসই খাও, আর দুধ-ছানাই খাও, গাছপালা না থাকিলে এসব কিছুই জুটিত না। কেন বলি শুন।

পৃথিবীতে দুই প্রকার জীবজন্তু আছে—এক যাহারা উদ্ভিদভোজী, অর্থাৎ গাছপালা খাইয়া জীবন ধারণ করে, —যেমন গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, হাতী, গণ্ডার ইত্যাদি।

দ্বিতীয়,—যাহারা মাংসভোজী, যেমন বাঘ, সিংহ, ইত্যাদি। গাছপালা না থাকিলে শুধু যে উদ্ভিদভোজী জীবজন্তু বাঁচিত না তাহা নয়, মাংসভোজী জীবজন্তুও বাঁচিত না, কারণ বাঘ, সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী জন্তু হরিণ, গরু ইত্যাদির মাংস খায় বটে, কিন্তু হরিণ, গরু ত গাছপালা খাইয়া বাঁচে ; সুতরাং মাংসভোজী জীবজন্তুর জীবনও শেষ পর্য্যন্ত গাছপালার উপর নির্ভর করে। মানুষ দুই রকম জিনিষই খায়—মাছ, মাংস খায় আবার ফল, মূল, তরকারীও খায়। সুতরাং দেখিতেছ যে তোমরা দুধ, ছানা, মাছ, মাংস যাহা খাও গাছপালা না থাকিলে কিছুই পাইবে না। গরু, মহিষ দুধ দেয় কিন্তু তাহারা বাঁচে গাছপালা খাইয়া। ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি যাহাদের মাংস খাও তাহারাও গাছপালা ও ঘাস খাইয়া বাঁচে, আবার মাছেরা মোটের উপর পরস্পরকে খাইয়া বাঁচে কিন্তু বড়গুলি ছোটগুলিকে খায় এবং ছোট মাছগুলি জলের ভিতরকার পচা গাছপালা খাইয়া বাঁচে।

সুতরাং পরিষ্কার বুঝা গেল যে গাছপালা না থাকিলে কোন জীবজন্তুর আহার জুটিত না ; সুতরাং কেহই বাঁচিত না—মানুষও নয়।

আবার অন্যদিকে দেখ। শুধু খাবার পাইলেই যে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি তাহা নয়। বরং না খাইয়া দুই একদিন বাঁচিতে পারি কিন্তু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস না লইয়া অতি অল্প সময়ও বাঁচি না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া আমাদের কি

উপকার হয় শুন। যখন আমরা নিঃশ্বাস লই, ঐ নিঃশ্বাসের সহিত ভিতরে যে বাতাস যায় তাহার ভিতর অম্লজান বাষ্প (Oxygen gas) থাকে। অম্লজান বাষ্পটি অতি দরকারী জিনিষ। ইহা ভিন্ন কোথাও আগুনের চিহ্ন থাকিত না। কারণ কাঠ, কয়লা বা গ্যাস ইত্যাদি জ্বালিয়া আগুন করার অর্থ এই যে সমস্ত দাহ্য পদার্থের ভিতর যে অঙ্গার ও উদজান নামক বাষ্প (Hydrogen gas) আছে তাহাদের সহিত বাতাসের অম্লজানের মিলন। যেখানে আগুন সেখানেই অম্লজান, এবং দহন বা পোড়ার অর্থই অম্লজানের সহিত মিলন। আমরা যে সকল জিনিষ আহার করি উহাদের ভিতরও উদজান ও অঙ্গার থাকে। নিঃশ্বাসের সহিত দেহের ভিতরে অম্লজান লইলে উহার সহিত খাদ্যদ্রব্যের উদজান মিলিয়া জল, ও অঙ্গার মিলিয়া অঙ্গারক বাষ্প তৈরী হয়। কাঠ, কয়লা বা মোমবাতি জ্বালিবার সময়ও এই সকল জিনিষ তৈরী হয়। সুতরাং আমাদের দেহের ভিতরও এক রকম দহন বা পোড়ার কাজ চলে। এইরূপে খাদ্যদ্রব্য হইতে আমরা শরীর রক্ষার উপযুক্ত তাপ ও শক্তি লাভ করি এবং এই শক্তি আমাদের মাংসপেশীতে সঞ্চিত করিয়া রাখি। সকল সময়ে আমরা আহার করি না কিন্তু সকল সময়েই আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, হাঁটা-চলা, কথা-বার্ত্তা ইত্যাদি কোন না কোন কাজ করিতে হয়, এবং তাহার জন্য ঐ সঞ্চিত শক্তি খরচ হয়।

ঐ খরচ পূরণ করিয়া রাখিবার জন্য এবং শরীর গঠনের জন্য মধ্যে মধ্যে আহার দরকার।

খাদ্যদ্রব্যের সহিত অম্লজান বাষ্পের মিলন দ্বারা যে অঙ্গারক বাষ্প তৈরী হয় উহা একটি বিষাক্ত জিনিষ। সেজন্য যখন আমরা প্রশ্বাস ত্যাগ করি তখন এই অঙ্গারক বাষ্পকে বাহির করিয়া দিই এবং সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস টানিয়া লইয়া বাতাসের সহিত বিশুদ্ধ অম্লজান গ্রহণ করি। মানুষের ন্যায় অন্যান্য জীবজন্তুও একইরূপ কাজ করে।

এখন দেখা যাক্ গাছপালা কি করিয়া বাঁচিয়া থাকে। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে জীবজন্তুর ন্যায় গাছপালারও আহারের দরকার হয়। গাছেরা শিকড় দিয়া মাটির ভিতর হইতে জল, ও পাতা দিয়া বাতাস হইতে অঙ্গারক বাষ্প টানিয়া লয়, এবং ঐ অঙ্গারক বাষ্প ও জলকে মিশাইয়া নিজের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে। গাছের এই খাদ্য তৈরী কাজের জন্য দুইটি প্রধান জিনিষের দরকার—একটি ক্লোরোফিল্ (Chlorophyll), অপরটি সূর্য্যকিরণ। এই ক্লোরোফিল্ জিনিষটি গাছের সবুজ পাতার ভিতর থাকে। ক্লোরোফিল্ সূর্য্যকিরণের সাহায্যে অঙ্গারক বাষ্প ও জলকে মিশাইয়া চিনি ও অম্লজান বাষ্প তৈরী করে। গাছেরা এই চিনি নিজেদের দেহের মধ্যে চারিদিকে টানিয়া লয় এবং অম্লজানকে বাতাসে ছাড়িয়া দেয়। চিনি হইতে পরে উহারা নিজেদের দেহের উপযোগী শ্বেত-সার (Starch) খাদ্য প্রস্তুত

করে। ধান, গম, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি কোন কোন গাছের ফলে বা শিকড়ে এই শ্বেত-সার সঞ্চিত থাকে।

রাত্রে যখন সূর্য্যকিরণ থাকে না তখন গাছেরা উল্টা কাজ করে। তখন ইহারা বাতাস হইতে অম্লজান লইয়া পূর্ব্বের সঞ্চিত শ্বেত-সারকে চিনিতে পরিণত করিয়া ঐ চিনির রস উহাদের শাখা প্রশাখার ভিতর পাঠায়। আক্, বিট্ ইত্যাদির রসে, এবং খেজুর, আঙ্গুর ইত্যাদি অনেক মিষ্ট ফলের ভিতর এই চিনি বিশুদ্ধ আকারে পাওয়া যায়।

পাতাই গাছের সব চেয়ে উপকারী জিনিষ, কারণ পাতার ভিতরে যে ক্লোরোফিল্ থাকে উহা ছাড়া জগতের আর কোন জিনিষের দ্বারা গাছেরা খাবার তৈরী করাইতে পারে না। আবার সূর্য্যকিরণ ছাড়া ক্লোরোফিল্ কোন কাজই করিতে পারে না। সুতরাং সূর্য্যকিরণ গাছপালাকে বাঁচাইয়া রাখিবার একমাত্র উপায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের খাদ্য হইতে শক্তি ও তাপ গ্রহণ করিবার জন্য অম্লজানের বিশেষ দরকার। ঐ অম্লজান বাতাসের ভিতর হইতে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। অসংখ্য গাছপালা খাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় সমস্ত দিন ধরিয়া অম্লজান বাষ্প বাতাসে ছাড়ে। মানুষ এবং জগতের অন্যান্য জীবজন্তু নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই অম্লজান বাষ্প ভিতরে টানিয়া লইয়া তবে জীবন রক্ষা করে। অবশ্য গাছ-গাছড়াও মানুষের নিঃশ্বাস লওয়ার ন্যায় বাতাস হইতে অম্লজান গ্রহণ

করে এবং উহাকে উহাদের দেহের সঞ্চিত চিনির সহিত মিশাইয়া অঙ্গারক বাষ্প ও জল তৈরী করে; আবার মানুষের ন্যায় ঐ অঙ্গারক বাষ্প বাতাসে ছাড়িয়া দেয়। এই কাজের দ্বারা উহারা যে তাপ সঞ্চয় করে তাহার দ্বারা উহারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, এবং উহাদের বীজ অঙ্কুরিত ও ফুলের বিকাশ হয়।

যদিও গাছ-গাছড়া বাতাস হইতে কিছু অম্লজান টানিয়া লয় বটে কিন্তু উহারা ক্লোরোফিলের দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় যত অম্লজান আবার বাতাসে ছাড়ে তাহার পরিমাণ অনেক বেশী। সেজন্য মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর আবশ্যকীয় অম্লজানের অভাব হয় না। নতুবা জগতের সব জীবজন্তুর জন্য যত অম্লজান দরকার হয় তাহাতে আমাদের চারিদিকে যত অম্লজান আছে সব এতদিনে খরচ হইয়া যাইত, এবং কালক্রমে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু শুধু অম্লজানের অভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে গাছপালা আমাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

এইবার ঈশ্বরের সৃষ্টির কথা একবার ভাবিয়া দেখ। জগতের কোন জিনিষই যে তুচ্ছ নয় এবং বিনা দরকারে যে কাহারও সৃষ্টি হয় নাই তাহা এই গাছপালার দৃষ্টান্ত হইতে বেশ বুঝা যায়। মাংসভোজীই হোক আর উদ্ভিদ-ভোজীই হোক সকল জীবজন্তুই শেষ পর্য্যন্ত গাছপালা

খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। আবার দেখ, মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু সর্ব্বদা প্রশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গারক বাষ্প বাহির করিয়া দিয়া বাতাসকে দূষিত করিতেছে, আর গাছপালা ক্লোরোফিলের দ্বারা সূর্য্যকিরণের সাহায্যে সেই অঙ্গারক বাষ্পকেই রূপান্তরিত করিয়া নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অত্যাবশ্যকীয় অম্লজান বাষ্প সরবরাহ করিতেছে। সুতরাং দূষিত অঙ্গারক বাষ্পকে দূর ও সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ অম্লজান সরবরাহ—এই দুই রকমে গাছপালা জীবজন্তুর অশেষ উপকার করিতেছে। আবার গাছপালাকে অঙ্গারক বাষ্প দিয়া আমরাও গাছপালার উপকার করিতেছি। অতএব জীবজন্তুর জীবন রক্ষার জন্য যেমন গাছপালার দরকার—আবার গাছপালার জন্যও সেইরূপ জীবজন্তুর দরকার। জগতে চিরদিনই গাছপালা ও জীব-জন্তুর ভিতর এইরূপ পরস্পর সাহায্যের আদান-প্রদান চলিতেছে, আর সূর্য্যকিরণের জন্যই এই আদান-প্রদান সম্ভব হইতেছে।

—:o:—

সূর্য্যই সকল শক্তির আধার

সূর্য্যদেব নিয়ম মত দিনের পর দিন—সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—আমাদের পৃথিবীতে কিরণ দিতেছেন, তাঁহার ছুটিও নাই, বিশ্রামও নাই; কিন্তু হঠাৎ যদি কোনদিন পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য তিনি কিরণ দেওয়া বন্ধ করেন তবে আমাদের কি দশা হয় বল দেখি? সেই কথা ভাবিয়া দেখা যাক্।

সূর্য্যকিরণ বন্ধ হইলে মানুষ যে সকল শক্তির সাহায্যে সর্ব্বদা নানাবিধ কাজ আদায় করিতেছে তাহার সবগুলিই নষ্ট হইয়া যাইবে। এই শক্তিগুলি কি কি তাহা দেখ:— প্রথম—জলের শক্তি; দ্বিতীয়—বায়ুর শক্তি; তৃতীয়—বাষ্পীয় শক্তি; চতুর্থ—তড়িত-শক্তি; পঞ্চম—আমাদের দেহের শক্তি। এখন এগুলির প্রত্যেকটিকে বিচার করিয়া দেখ।

১। জলের শক্তি—নদী, হ্রদ বা সাগর হইতে অনেক জল যদি কোন উঁচু পাহাড়ের উপর উঠাইয়া সেখান হইতে নীচে ফেলা যায় তবে সেই জল পড়িবার সময় অনেক কাজ করিতে পারে। উঁচু হইতে জল পড়িবার সময় উহার নীচে

যদি কোন চাকা রাখা যায় তবে ঐ জল চাকাকে জোরে ঘুরাইতে পারে (১নং চিত্র দেখ)। তোমরা জলপ্রপাতের কথা বোধ হয় জান। জলপ্রপাতের জল আপনা আপনি খুব উঁচু জায়গা হইতে নীচে পড়ে। কারখানায় তড়িত সৃষ্টি করিবার জন্য ডাইনামো নামক একটি যন্ত্রকে ইঞ্জিন দিয়া খুব জোরে ঘুরাইতে হয়। ইঞ্জিনকে আবার জল বাষ্পের দ্বারা বা তেলের বাষ্পের
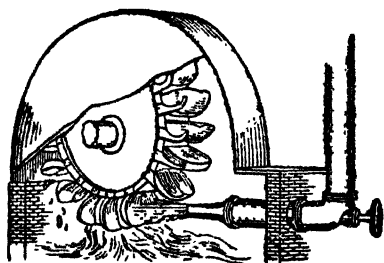
নং চিত্র।

উপর হইতে জল পড়িয়া চাকাকে জোরে ঘুরাইতেছে।

দ্বারা চালান হয়। উভয় প্রকারেই ইঞ্জিনকে চালাইতে পয়সা খরচ হয়। কিন্তু জলপ্রপাতের জল পড়িবার সময় তাহাকে ধরিয়া একটি বড় চাকার উপর ফেলিয়া ঐ চাকাকে ঘুরাইয়া ডাইনামো চালাইলে অতি সামান্য খরচেই তড়িত তৈরী করিতে পারা যায়। এইরূপে জলের শক্তি লইয়া কত বড় বড় তড়িতের কারখানা চলিতেছে। তড়িত

সৃষ্টি করা ছাড়া কারখানার অন্যান্য কাজও জলের শক্তির সাহায্যে অনায়াসে চলিতে পারে। তোমরা বোধহয় উত্তর আমেরিকার প্রসিদ্ধ নায়গ্রা জলপ্রপাতের নাম শুনিয়াছ। ঐ জলপ্রপাতের অতি সামান্য মাত্র শক্তি ব্যবহার করিয়া উত্তর আমেরিকার কত কারখানা চলিতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে শুধু নায়গ্রার জলপ্রপাত হইতে এত শক্তি পাওয়া যাইতে পারে যাহা পৃথিবীতে যত ইঞ্জিন বাষ্পীয় শক্তির জোরে চলে ·সেই সব গুলিকে চালাইয়াও আরও কিছু বাঁচিয়া যাইবে। আমাদের দেশেও এইরূপ জল-প্রপাতের জল লইয়া মহীশূর রাজ্যে শিবসমুদ্রম্ নামক জায়গায় একটি ও বোম্বাই মহাদেশে খাপোলী নামক জায়গায় একটি তড়িতের কারখানা চলিতেছে। তোমরা বড় হইয়া দেখিতে যাইও।

এইসব জলপ্রপাতের শক্তির মূল কোথায় ? কে জলকে উঠাইয়া অত উঁচু পাহাড় পর্ব্বতের উপর পাঠাইল ? সূর্য্য কিরণই এই কাজ করিয়াছে। সূর্য্যকিরণই সাগরের জলকে বাষ্পে পরিণত করে। ঐ বাষ্প হইতে মেঘ, ও মেঘ হইতে বৃষ্টি হইয়া পাহাড় পর্ব্বতের উপর পড়িয়া নদী ও জল-প্রপাতের জল সরবরাহ করে।

২। **বাতাসের শক্তি**—বাতাসের শক্তির পরিচয় তোমরা অনেক পাইয়াছ। নদীতে পাইল টানাইয়া বড় বড় নৌকাগুলি বাতাসের শক্তির জোরেই অনায়াসে চলে।

আজকাল ষ্টীমার ও জাহাজগুলি সব বাষ্পীয় শক্তির দ্বারা চলে বটে, কিন্তু বহু পূর্ব্বে সব দেশেরই বড় বড় জাহাজগুলি পাইল টানাইয়া শুধু বাতাসের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া দূর-দূরান্তরে যাতায়াত করিত। ইহা ছাড়া অনেক স্থানে জলের শক্তির ন্যায় বায়ুপ্রবাহ দ্বারা চালিত যন্ত্র দিয়া কার-খানার নানা কাজ করাইয়া লওয়া হয়। বায়ুপ্রবাহ চালিত যন্ত্রকে সাধারণতঃ চাষের ক্ষেত্রে জল পাম্প করা বা শস্যাদি চূর্ণ করা ইত্যাদি কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বায়ুপ্রবাহের জোর সকল সময় একরূপ থাকে না, সেজন্য অন্য শক্তির তুলনায় ইহার দ্বারা কাজ সুবিধাজনক হয় না। তথাপি ইউরোপে—বিশেষতঃ ডেনমার্কে—ও আমেরিকায় এরূপ অনেক যন্ত্র চলিয়া থাকে।

এই শক্তির মূলেও সূর্য্যকিরণ, কারণ বাতাস এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় না চলিয়া স্থির থাকিলে তাহার দ্বারা কোন কাজ পাওয়া যায় না। সেরূপ অচল বাতাস শক্তিহীন। বাতাসকে চালাইতে হইলে সূর্য্যকিরণের আবশ্যক। সূর্য্যকিরণ পৃথিবীকে গরম করে—কোথাও কম, কোথাও একটু বেশী। সাধারণতঃ নিরক্ষবৃত্তের কাছা-কাছি জায়গা বেশী গরম ও মেরুপ্রদেশের কাছাকাছি জায়গা কম গরম হয়। যেখানে গরম বেশী সেখানকার বাতাসও বেশী গরম হয়। বাতাস গরম হইলে হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠে, এবং অন্য দিক হইতে ঠাণ্ডা বাতাস সেই জায়গা

দখল করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। এইরূপে একদিক হইতে অন্যদিকে বাতাসের স্রোত চলে। সূর্য্যকিরণ না থাকিলে বাতাস গরম হইত না, সুতরাং একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলাচল করিতে পারিত না, এবং তাহা হইলে সে বাতাস হইতে কোন শক্তিও পাওয়া যাইত না।

৩। **বাষ্পীয় শক্তি**—বাষ্পীয় শক্তির প্রভাবেই রেল, ষ্টীমার ও কত ছোট বড় কল কারখানা চলিতেছে। জলকে কোন আবদ্ধ পাত্রে গরম করিয়া বাষ্পাকারে পরিণত করিলে উহা যখন জোরে বাহির হইতে চায় তখন সেই শক্তিকে নানা কাজে লাগান হয়। জল হইতে এই শক্তি পাইতে হইলে তাহাকে গরম করার দরকার, এবং গরম করিতে হইলে কাঠ, কয়লা ইত্যাদি যে কোন দাহ্য পদার্থের আবশ্যক। কাঠ, গাছপালা হইতে পাওয়া যায়, এবং কয়লাও লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মাটির নীচে চাপাপড়া গাছপালা হইতে তৈরী হয়। আবার গাছপালা যে সূর্য্যকিরণ ছাড়া বাঁচিতে পারে না একথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। সুতরাং যদিও জল হইতে বাষ্পীয় শক্তি পাওয়া যায় তথাপি সূর্য্য-কিরণই এই শক্তির মূল।

৪। **তড়িত-শক্তি**—আজকাল তড়িত-শক্তি প্রস্তুত করিবার কারখানা আমাদের ভারতবর্ষেও প্রায় সকল বড় বড় সহরেই আছে। এরূপ যে কোন কারখানায় গেলে দেখিতে

পাইবে যে তড়িত প্রস্তুত করিবার জন্য ডাইনামো নামক একটি যন্ত্রকে খুব জোরে বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরাইতে হয়। উহাকে হাত দিয়া ঘুরান অসম্ভব, সেজন্য উহাকে ঘুরাইবার জন্য ষ্টীম-ইঞ্জিন—অর্থাৎ জলবাষ্পের দ্বারা চালিত যন্ত্র—অথবা অয়েল-ইঞ্জিন—অর্থাৎ তৈলবাষ্পের দ্বারা চালিত যন্ত্র—ব্যবহার হয়। ষ্টীম-ইঞ্জিন চালাইতে হইলে জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত যে সূর্য্যকিরণ আবশ্যক তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অয়েল-ইঞ্জিন চালাইতে হইলে কেরোসীন, পেট্রোল ইত্যাদি তেলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিতে হয়। ঐ সমস্ত তেল পেট্রোলিয়ম নামক একপ্রকার খনিজ তৈলাক্ত পদার্থ হইতে পাওয়া যায়। কয়লার মূল যেমন গাছপালা এই পেট্রোলিয়মও সেইরূপ কোটি কোটি বছর পূর্ব্বের মাটি ও পাহাড়ের তলে চাপা পড়া গাছপালা ও জীবজন্তুর দেহাবশেষ হইতে তৈরী। স্নুতরাং তড়িত-শক্তির মূলেও যে সূর্য্যকিরণ তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

৫। **দেহের শক্তি**—উপরে যে সব শক্তির কথা বলিলাম সে সব ছাড়া আমরা নিজেদের দেহের শক্তির দ্বারা অনেক কাজ করিতে পারি; তাহা ছাড়া গরু, ঘোড়া ইত্যাদি জীবজন্তুকে খাটাইয়াও অনেক কাজ পাইয়া থাকি। আমাদের এবং অন্যান্য সকল জন্তুর দেহের শক্তি আসে খাদ্য হইতে; গরু, ঘোড়া ইত্যাদির খাদ্য গাছ-গাছড়া, এবং

আমাদের খাদ্য গাছ-গাছড়া ও মাছ-মাংস উভয় প্রকার; কিন্তু এই সকল প্রকার খাদ্যের মূল যে সূর্য্যকিরণ তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভাল করিয়া বলিয়াছি।

সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে মানুষ যে সকল শক্তিকে কাজে লাগাইয়া জগতের নানা প্রকার কাজকর্ম্ম চালাইতেছে **সূর্য্যই সেই সকল শক্তির আধার।**

অবশ্য যে সকল শক্তির কথা তোমাদের বলিলাম তাহা ছাড়া আর একটি শক্তি আছে যাহা সূর্য্যকিরণের উপর ততটা নির্ভর করে না—তাহা সমুদ্রের জোয়ার ভাটার শক্তি। সমুদ্রের জোয়ার ভাটার জন্য সকল নদীতে যে স্রোত চলে তাহা বড় বড় নৌকা বা জাহাজকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইতে পারে তাহা তোমরা জান। ইহা ছাড়া জোয়ারের জল যেখানে খুব উঁচুতে উঠে, তখন সেখানে কোন বড় জায়গায় সেই জল ধরিয়া রাখিয়া ভাটার সময় সেই উঁচু জায়গা হইতে জল ছাড়িয়া দিয়া ঐ জলস্রোতের জোরে কলকারখানা চালান যায়; কিন্তু জোয়ারের জল খুব বেশী উঁচুতে না উঠিলে এই শক্তি বিশেষ কোন কাজে আসে না; সেজন্য জোয়ার ভাটার এইরূপ শক্তি কোন জায়গায় সেরূপ কাজে লাগান হয় না।

তোমরা জান বোধহয় যে চন্দ্র ও পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে সমুদ্রের জল উঁচু হইয়া উঠে এবং পরে পৃথিবী যে

নিজের অক্ষের উপর চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘুরিতেছে তাহার জন্য ঐ উঁচু জল একদিক হইতে অন্যদিকে চালিত হয়—যাহাকে আমরা **জোয়ার ভাটা** বলি।

এই সমস্ত বিবিধ শক্তি ছাড়া সূর্য্যকিরণ হইতেই সকল আলো ও তাপের উৎপত্তি। সূর্য্য অস্ত গেলে যখন রাত্রি আসে তখন সকল আলো নিভিয়া যায়, সকল পৃথিবী আঁধারে ঢাকিয়া যায়। তেল, গ্যাস বা বিজলী-বাতি জ্বালাইয়া আমরা আলো পাইতে পারি বটে; কিন্তু কেরোসীন, পেট্রোল ইত্যাদি তেল জ্বালাও, অথবা কয়লা চোলাই করিয়া যে গ্যাস পাওয়া যায় তাহা জ্বালাও, কিংবা বিজলী-বাতির জন্য তড়িত-শক্তি প্রস্তুত কর, প্রত্যেক কাজেই সূর্য্যকিরণের দরকার। সুতরাং দিনের আলো বা কৃত্রিম আলো সকল রকম আলোর মূল সূর্য্যকিরণ।

তারপর সকল তাপের মূলও সূর্য্যকিরণ। প্রভাতে সূর্য্য উঠিলেই সকল পৃথিবী তাপ পায়; তাহা ছাড়া কাঠ, কয়লা, তেল ইত্যাদি জ্বালাইয়া যে তাপ পাওয়া যায় তাহাও যে সূর্য্যকিরণ হইতেই উৎপন্ন সে বিষয় পূর্ব্বেই জানিয়াছ।

সূর্য্যের আলোর উপর আর একটি জিনিষ নির্ভর করে তাহা ফটোগ্রাফি। কতকগুলি রাসায়নিক জিনিষের উপর সূর্য্যকিরণের ক্রিয়া দ্বারা ফটোগ্রাফির কাজ হয়। সুতরাং সূর্য্যকিরণের অভাবে ফটোগ্রাফির ন্যায় সুন্দর জিনিষটিও

থাকিত না; আর তাহা না থাকিলে বায়স্কোপের সৃষ্টিও হইত না।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে সূর্য্যই পৃথিবীর জীবন। প্রায় পাঁচ কোটি ক্রোশ দূরে বসিয়া তিনি যে কিরণ দিতেছেন তাহার দশকোটি ভাগের এক ভাগও হয়ত পৃথিবী পর্য্যন্ত পৌঁছায় না; কিন্তু তাহার জন্যই পৃথিবীতে আলো আছে, তাপ আছে, শক্তি আছে—সুতরাং জীবন আছে। সূর্য্যদেব তাঁহার কিরণ বন্ধ করিলে আমাদের কি দশা হয় বল ত?

সূর্য্যদেব না থাকিলে মেঘ ডাকিবে না, জল পড়িবে না, বায়ু বহিবে না; জল ও তাপ ব্যতীত গাছপালা জন্মিবে না, ফসল হইবে না, সুতরাং খাদ্য জুটিবে না। আবার রেশম, পশম, কার্পাস কিছুই থাকিবে না; সুতরাং কোন প্রকার বস্ত্রও থাকিবে না;—মোটের উপর মানুষের অন্ন-বস্ত্র জুটাইবার কোন উপায় থাকিবে না, এবং বাসস্থান তৈরী করাও অসম্ভব হইবে। আবার আলোকের অভাবে মানুষ চক্ষু পাইয়াও অন্ধ হইবে।

মোটের উপর স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সূর্য্যদেবের অভাবে আমাদের শেষ দশা উপস্থিত হইবে। শুধু আমাদের কেন, সূর্য্যের অভাবে গরু, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তুর এবং বৃক্ষ-লতা ইত্যাদির কিছুই বর্ত্তমান থাকিবে না। কোথাও জীবনের

চিহ্ন থাকিবে না। নদ, নদী, সাগর, মহাসাগর সব শুকাইয়া ফল-ফুল, গাছ-পালা শোভিত এই সুন্দর পৃথিবী এক বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হইবে।

—:০:—

ট্রামগাড়ী কিরূপে চলে?

কলিকাতার রাস্তায় ট্রামগাড়ী দেখ নাই তোমাদের মধ্যে এমন বোধ হয় কেহই নাই। আর ট্রামগাড়ী যে তড়িত-শক্তির জোরে চলে তাহাও তোমরা প্রায় সকলেই শুনিয়াছ। কিন্তু এই তড়িত-শক্তি কোথা হইতে আসে, কিরূপেই বা তড়িত-শক্তির দ্বারা মানুষ বোঝাই অত বড় গাড়ী গড় গড় করিয়া চলিতে থাকে, আর ট্রামের রাস্তার ধার দিয়া বরাবর খুঁটির উপর দিয়া তার লাগাইয়া রাখিবারই বা কারণ কি—ইত্যাদি বিষয় তোমরা বোধ হয় জান না। সেই সব কথা এখন বলিব।

তোমরা চুম্বক দেখিয়াছ কি? ঘোড়ার ক্ষুরের মত চেহারা বিশিষ্ট ছোট ছোট চুম্বক বাজারে অনেক কিনিতে

পাওয়া যায়। এগুলি একখানি বাঁকানো লোহা ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু উহার নিকট সূচ, আলপিন, চাবি বা লোহার আর কোন জিনিষ রাখিলে দেখিবে যে চুম্বকটি ঐ সব জিনিষকে নিজের দিকে টানিতেছে। জিনিষটি ক্রমে বেশী নিকটে আনিলে চুম্বকের টানিবার শক্তির জোরে উহা ছুটিয়া গিয়া চুম্বকের গায়ে আট্‌কাইয়া যাইবে (১নং চিত্র দেখ)। লোহার জিনিষকে নিজের কাছে টানিয়া আনাই চুম্বকের ধর্ম্ম।

১নং চিত্র।
ঘোড়াক্ষুর চুম্বক

চুম্বকের সহিত তড়িতের খুব নিকট সম্বন্ধ। একটি ঘোড়াক্ষুর চুম্বকের দুই মুখের ফাঁকের মধ্যে একটি বাঁকানো তামার তারকে ঝুলাইয়া যদি ঐ তারের দুই প্রান্ত উপরে কোথাও এমন ভাবে আট্‌কাইয়া রাখা হয় যাহাতে তারটি খুব সহজেই এদিক ওদিক ঘুরিতে পারে, তবে ঐ তারের মধ্যে তড়িত চালাইয়া দিলে তারটি চুম্বকের দুই মুখের ফাঁকের মাঝ-খানে আপনিই ঘুরিয়া যাইবে। এই মজার এবং অতি দরকারী ব্যাপারটি প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে *। এই সামান্য

* লেখক প্রণীত "বিজ্ঞান কাহিনী"তে ফ্যারাডের জীবনী পাঠ কর

ব্যাপারটির উপর নির্ভর করিয়াই ইলেক্‌ট্রিক মোটর, ডাইনামো ইত্যাদি তৈরী হইয়াছে—যাহার জন্য বিজলী বাতি জ্বলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে, ট্রাম চলিতেছে এবং আরও কত হাজার হাজার রকম কাজ হইতেছে—এক কথায় মানুষের সভ্যতা কত আগাইয়া গিয়াছে।

এই মোটর ও ডাইনামো দু'টা জিনিষই ট্রামগাড়ী চালাইবার জন্য বিশেষ দরকার। সেজন্য অতি সংক্ষেপে আগে ইহাদের কথা বলিতেছি। ঘোড়াক্ষুর চুম্বকের দুই মুখের ফাঁকের মধ্যে একটি তামার তার ঝুলাইয়া উহার ভিতর তড়িত চালাইয়া দিলে তারটি ঘুরিয়া যাইবে তাহা এখনই বলিলাম। তামার তারের কথা বলিলাম এইজন্য যে, তামার ভিতর তড়িত খুব সহজে যাতায়াত করিতে পারে। অবশ্য লোহা, তামা, রূপা ইত্যাদি সব ধাতুর ভিতর দিয়া তড়িত যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু লোহা অপেক্ষা তামার ভিতর দিয়া তড়িত আরও সহজে যাতায়াত করে। রূপার ভিতর দিয়া যদিও সহজে যায়, কিন্তু তামা সস্তা বলিয়া তড়িত চলাচল কাজের জন্য তামার তারই ব্যবহার করা হয়। বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক আলো বা পাখায় তড়িত আসিবার জন্য ঘরের দেওয়ালের গায়ে তার লাগাইয়া যে রাস্তা তৈরী করা হয় সে সবই তামার তার।

চুম্বকের দুই মুখের মধ্যে একটি তারের পরিবর্ত্তে দু'টি তিনটি বা আরও অনেক বেশী তার ঐরূপ ভাবে রাখিয়া

তাহাদের ভিতর দিয়া তড়িত চালাইলে সব তারগুলিই পূর্ব্বের ন্যায় ঘুরিয়া যাইবে। আবার তারগুলি ঐরূপ ভাবে না ঝুলাইয়া ২নং চিত্রের মত একটা লোহার দণ্ডের মাঝখানে
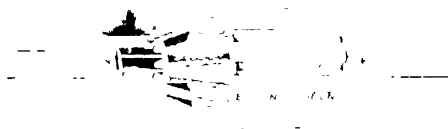
২নং চিত্র।

তার জড়ানো দণ্ড।

উহাদিগকে এদিক ওদিক করিয়া জড়াইয়া রাখাও যায়। তারপর ঐ তার জড়ানো দণ্ডটিকে যদি একটা বড় ঘোড়াক্ষুর চুম্বকের দুই মুখের ফাঁকের মাঝখানে এমনভাবে রাখা যায় যে দরকার হইলে দণ্ডটি সহজেই ঘুরিতে পারে, তখন ঐ তারগুলির ভিতর দিয়া তড়িত চালাইয়া দিলে সমস্ত দণ্ডটি বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে থাকিবে। চুম্বক সমেত ঐরূপ তার জড়ানো দণ্ডের নাম দেওয়া হইয়াছে মোটর (motor)।

মোটরের দণ্ডের সহিত যদি আর কোন চাকা এমনভাবে আট্‌কান থাকে যে দণ্ডটি ঘুরিলে ঐ চাকাটিও ঘুরিবে, তাহা হইলে তড়িত-শক্তির জোরে মোটরটি যখন বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে থাকে সেই সঙ্গে আট কানো চাকাটিও বোঁ

বোঁ করিয়া ঘুরিতে থাকিবে। যে সকল কল কারখানায় তড়িত-শক্তির ব্যবহার হয়, সেখানে এইরূপ মোটর ঘুরাইয়া অন্যান্য জিনিষ চালান হয়।

মোটরের তারের মধ্যে তড়িত চালাইলে উহার দণ্ডটি বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে থাকে তাহা বুঝিলে; কিন্তু ঐ তারের বাণ্ডিলের মধ্যে তড়িত না চালাইয়া যদি অন্য কোন উপায়ে ঐ দণ্ডটি খুব জোরে ঘুরান যায় তবে ঠিক উল্টা ফল হইবে; অর্থাৎ তখন তারের মধ্যে তড়িত সৃষ্ট হইবে।
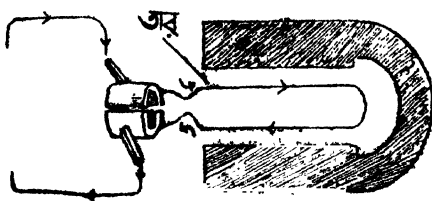
৩নং চিত্র। ডাইনামো।

ঐ তড়িত লইয়া তখন আলো জ্বালা, পাখা ঘুরান বা কল কারখানা চালান ইত্যাদি কাজ করা যাইতে পারে। এইরূপে তড়িত তৈরী করিবার জন্য চুম্বক সমেত তার জড়ানো দণ্ডটির নাম দেওয়া হইয়াছে "ডাইনামো" * (dynamo)। আলো জ্বালা, পাখা ঘুরান, ট্রামগাড়ী ও কলকারখানা চালান ইত্যাদি যে সব কাজে অধিক তড়িত

* ৩নং চিত্রে মাত্র একটি তার দেখান হইয়াছে

শক্তির দরকার হয় তাহা এইরূপে ডাইনামো দ্বারা তৈরী হয়। ডাইনামো ও মোটরের চেহারা দেখিতে একইরূপ; কিন্তু ডাইনামো তড়িত তৈরী করে; আর সেই তড়িতকে মোটরে পাঠাইয়া উহার দণ্ডকে ঘুরাইয়া নানাবিধ কাজ করা হয়।

এইবার ট্রামগাড়ীর কথা ধরা যাক্। এতক্ষণ ধরিয়া তোমাদের মোটরের বিষয় বুঝাইবার কারণ এই যে, মোটর দিয়াই ট্রামগাড়ী চালান হয়। তোমরা যে ইলেক্‌ট্রিক পাখা দেখিয়াছ ঐ পাখার পাতাগুলি যেখানে আংটা দিয়া লাগান থাকে তাহার ঠিক উপরে একটি গোলাকার লোহার খোল আছে। ঐ খোলের ভিতর একটি ছোট মোটর থাকে, এবং উহার দণ্ডের নীচে আংটাগুলি লাগান থাকে। উপরের তার দিয়া তড়িত আসিয়া যখন মোটরটিকে ঘুরায় তখন তাহার সহিত আট্‌কানো পাখার পাতগুলিও ঘুরিতে থাকে।

ট্রামগাড়ীর চাকাও ঐরূপ একই উপায়ে ঘোরে। কলিকাতার রাস্তায় যে ট্রামগাড়ী চলে তাহাতে দু'খানি গাড়ী থাকে; কিন্তু ঐ দু'খানির মধ্যে প্রথম গাড়ীখানি রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের মত পিছনের গাড়ীখানিকে টানিয়া লইয়া যায়। কোন কোন সহরে শুধু একখানি গাড়ী থাকে (৪নং চিত্র দেখ)। ঐ গাড়ীর তলদেশে একটি বড় মোটর থাকে, আর উহার দণ্ডের সহিত গাড়ীর সম্মুখের বা পিছনের দু'খানি চাকা এমনভাবে আট্‌কান থাকে যে

যখনই মোটরের দণ্ডটি ঘুরিবে সেই সঙ্গে ঐ চাকা দু'খানিও ঘুরিতে থাকিবে। সুতরাং মোটরের ভিতর তড়িত চালাইয়া উহার দণ্ডটিকে ঘুরাইলেই গাড়ীর চাকাও ঘুরিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীখানিও চলিতে থাকিবে।
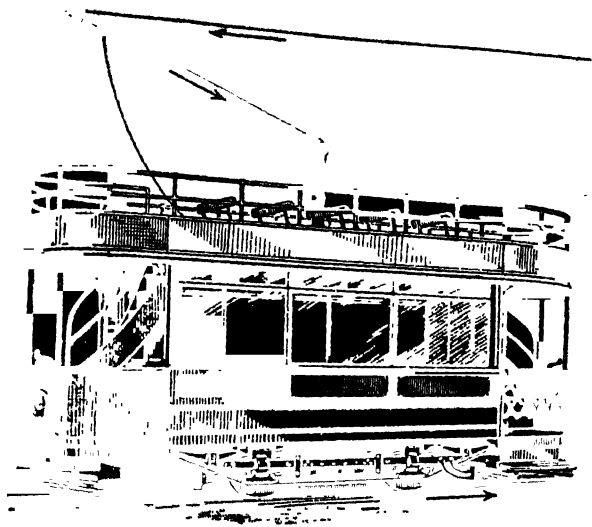
৪ নং চিত্র। ট্রামগাড়ী।
উপরের তার দিয়া তড়িত-স্রোত আসিয়া দণ্ডের ভিতর দিয়া নীচের মোটরে যাইতেছে।

এখন দেখা যাক যে, গাড়ীর নীচের মোটরের ভিতরে তড়িত কোন পথ দিয়া আসে। ইট-পাথরের রাস্তার উপর দিয়া গাড়ী চলিলে রাস্তার সহিত গাড়ীর চাকার

ঘর্ষণের ফলে অনেকটা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সেজন্য রেল গাড়ীর মত ট্রামগাড়ীর চাকাগুলিকেও লোহার পাটি পাতা রাস্তার উপর দিয়া চালান হয়। তোমরা দেখিয়াছ যে ঐ রাস্তার ধারে ধারে বড় বড় খুঁটির উপর দিয়া তামার মোটা তার বরাবর চলিয়া গিয়াছে। আর ইহাও বোধ হয় দেখিয়াছ যে ট্রামগাড়ীর ছাদের উপর একটী লম্বা ও মোটা লোহার দণ্ড স্প্রীং দিয়া এরূপভাবে আটকান আছে যে দণ্ডটিকে দরকার মত উঁচু নীচু করা যায় এবং ঘুরান যায়। ঐ দণ্ডের মাথায় একটি ছোট চাকা লাগান থাকে (৪নং চিত্র দেখ)। ঐ চাকার ভিতর খাঁজ আছে। গাড়ী চলিবার সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিও যে ঐ ছোট চাকাটি উপরের তারের গায়ে বরাবর খাঁজে খাঁজে লাগান থাকে।

ট্রামগাড়ীর কারখানায় যেখানে তড়িত তৈরী হয়, সেখান হইতে রাস্তার খুঁটির মাথার তারের মধ্য দিয়া সকল সময় তড়িত চালান হয়। যতক্ষণ গাড়ীর ছাদের উপরের দণ্ডের মাথার ছোট চাকাটি ঐ তার ছুইয়া থাকে ততক্ষণ ঐ চাকা ও দণ্ডের ভিতর দিয়া তড়িত-স্রোত গাড়ীর নীচে রক্ষিত মোটরের ভিতর আসিয়া উহার দণ্ডটিকে বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরায়, আর সেই সঙ্গে আটকানো গাড়ীর চাকাকেও ঘুরাইয়া দেয়; সুতরাং গাড়ীও চলিতে থাকে। গাড়ীর সম্মুখে যে লোকটি দাঁড়াইয়া থাকে ঐ লোকটিকে ড্রাইভার বা গাড়ী-চালক বলে। তোমরা দেখিয়াছ যে ড্রাইভার

সর্ব্বদা একটি হ্যাণ্ডেল বা হাতলে হাত দিয়া থাকে। ঐ হাতলটি একটি যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন আছে। তড়িত স্রোতকে উপর হইতে গাড়ীর নীচে যাইবার পথে ঐ যন্ত্রটির ভিতর দিয়া যাইতে হয়। যন্ত্রটির গুণ এই যে উহার হাতল ঘুরাইয়া মোটরের ভিতর ইচ্ছামত কম বেশী তড়িত পাঠান যায়। যখন গাড়ীর বেগ কম করার দরকার হয় তখন ড্রাইভার হাতল ঘুরাইয়া তড়িতের পরিমাণ কম করিয়া দেয়, এবং গাড়ী থামাইবার দরকার হইলে তড়িতের পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়।

গাড়ীর পিছনে যে লোকটি থাকে তাহাকে কণ্ডাক্টর বলে, যাহার হুকুম মত ড্রাইভার গাড়ী চালায় বা থামায়। প্রায়ই দেখিয়া থাকিবে যে কণ্ডাক্টর একটি দড়ি হাতে করিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। ঐ দড়ি দিয়া গাড়ীর ছাদের লম্বা দণ্ডটি বাঁধা থাকে। দণ্ডের মাথার ছোট চাকাটি উপরের তার হইতে সরিয়া বাহিরে গেলেই তখনই তড়িত-স্রোতের পথ বন্ধ হইয়া গাড়ী থামিয়া যায়। সেজন্য কণ্ডাক্টর নীচে হইতে ঐ দড়ি দিয়া দণ্ডটিকে এদিক ওদিক সরাইয়া উহার মাথার ছোট চাকাটিকে আবার তারে লাগাইয়া দেয়।

আশা করি ট্রামগাড়ী কি করিয়া চলে তাহা এতক্ষণে বুঝিয়াছ। এইবার যখন ট্রামগাড়ী চড়িবে তখন যে সব জিনিষের কথা পড়িলে সেগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিও।

তোমরা এখন ট্রামগাড়ী দেখিতেছ বটে, কিন্তু সাতাশ আটাশ বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতায় ঘোড়ার ট্রাম ছিল। আমরা খুব ছোট বেলায় ঘোড়ার ট্রামেই চড়িয়াছি। তখনও এইরূপ লোহার পাটি পাতা রাস্তার উপর দিয়া গাড়ীগুলি যাইত, কিন্তু তখন এই সব খুঁটি বা তার কিছুই ছিল না। তারপর ১৯০৪ সাল হইতে কলিকাতায় ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রাম চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমেরিকায় প্রথম ঘোড়ার ট্রাম চলা আরম্ভ হয়; কিন্তু ঘোড়ার ট্রাম ত ঘণ্টায় পাঁচ ছয় মাইলের বেশী জোরে চলিতে পারিত না, সেজন্য আরও কম সময়ে সহরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইবার জন্য নানা চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তড়িতের যন্ত্রপাতির কিছুই উন্নতি না হওয়ায় ঐ সকল চেষ্টার বিশেষ কোন ফল হয় নাই।

পরে ১৮৭৯ সালে জার্ম্মানীর বার্লিন সহরে একটি প্রদর্শনী বসে। সেখানে সিমেন্স নামে জার্ম্মানীর সুপ্রসিদ্ধ তড়িতবিদ্যাবিশারদ ও হাল্‌স্কে নামক আর এক ব্যক্তি উভয়ে মিলিয়া পাঁচ ছয় শত ফিট দীর্ঘ একটি ছোট লাইন বসাইয়া তড়িত-শক্তির জোরে রেলগাড়ী চালাইবার প্রথম নমুনা দেখান। যদিও এই প্রথম পরীক্ষা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয় নাই, তথাপি ইহা দেখিয়াই সহরের রাস্তার উপর দিয়া তড়িত-শক্তির জোরে ট্রামগাড়ী চালাইবার চেষ্টা প্রায় সকল দেশেই আরম্ভ হইল। ১৮৮১ সালে প্যারিসের

প্রদর্শনীতে অনেকটা আজকালকার মত সন্তোষজনক উপায়ে ট্রামগাড়ী চালাইবার নমুনা দেখান হয়। ১৮৮২ সালে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ 'যাদুকর' বৈজ্ঞানিক এডিসন একটি ছোট লাইন বসাইয়া তড়িত-শক্তি দ্বারা চালিত রেলগাড়ীর নমুনা দেখান। ইহার পর সাত আট বৎসরের মধ্যেই ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সকল সহরেই ট্রাম-গাড়ীর প্রচলন হইল। ১৮৯১ সালে বিলাতের লীড্‌স সহরে প্রথম ইলেক্‌ট্রিক ট্রামের প্রচলন হয় এবং তাহার পর দুই এক বৎসরের মধ্যেই প্রধান প্রধান সকল সহরেই ট্রাম চলিতে আরম্ভ হয়।

আমাদের দেশের সব রেলগাড়ী বাষ্পীয় শক্তির জোরে চলে, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক জায়গায় তড়িত শক্তির সাহায্যে রেলগাড়ী যাতায়াত করে। লণ্ডন সহরের টিউব-রেলওয়ের নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। ইহা একটি আশ্চর্য্য জিনিষ। লণ্ডন সহরের রাস্তায় গাড়ী, মোটর, লোকজন এত বেশী যাতায়াত করে যে, উপরে স্থান সঙ্কুলান হয় না। এজন্য যাহাতে সহরতলী হইতে লোকজন ইচ্ছামত সহরে যাওয়া আসা করিতে পারে সেজন্য মাটির নীচে চারিদিকে সুড়ঙ্গ কাটিয়া তাহার ভিতর দিয়া রেলের রাস্তা বসান হইয়াছে। ঐ সকল রেলগাড়ীকে তড়িত শক্তির সাহায্যে চালান হয়। বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ঐরূপ সুড়ঙ্গ সহরের পাশের টেম্‌স নদীর তল দিয়াও

চলিয়া গিয়াছে, এবং ঐ নদীর তল দিয়া রেলগাড়ী যাতায়াত করে। আমরা চিরকালই দেখি যে নদীর উপরে সাঁকোর বা পুলের উপর দিয়া গাড়ী, ঘোড়া সব যাতায়াত করে ও তাহার নীচে জলের উপর দিয়া নৌকা, ষ্টীমার চলে; কিন্তু টেম্‌স নদীতে ইঞ্জিনিয়ারগণের বাহাদুরীর দ্বারা ইহার উল্টা ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে—সেখানে "উপরে জাহাজ চলে, নীচে চলে নর।"

—:o:—

বায়ুর চাপের কথা

সে বহুদিনের কথা। আন্দাজ ১৬২৫ সালে ইতালীর টাস্কানী দেশের অধিপতি তাঁহার রাজপ্রাসাদে জল সরবরাহ করিবার জন্য একদিন একটি গভীর ও বৃহৎ কূপ খুঁড়িবার হুকুম দিলেন। লোক-লস্কর কাজে লাগিয়া গেল, এবং খুঁড়িতে খুঁড়িতে শেষে চল্লিশ ফুট নীচে জল পাওয়া গেল। এত গভীর কূপ হইতে রাজপ্রাসাদে সহজে জল উঠাইবার জন্য কূপের উপর পাম্প (Pump) বসিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, শত চেষ্টা করিয়াও পাম্প দিয়া জল

উপরে উঠান গেল না। তখন দেশের শ্রেষ্ঠজ্ঞানী বৃদ্ধ গেলিলিওর ডাক পড়িল। গেলিলিও কারণ অনুসন্ধানে লাগিয়া গেলেন। যদিও সেই সময় পাম্পের প্রচলন ছিল, কিন্তু কি জন্য যে পাম্পের ভিতর দিয়া জল উপরে উঠে তাহার প্রকৃত কারণ তখনকার জ্ঞানী লোকেরাও জানিতেন না।

কি করিয়া পাম্পের ভিতর জল উঠে তাহা তোমরা কাচের পিচকারী বা দোলের সময় রং খেলিতে যে টিনের বা পিতলের পিচকারী ব্যবহার কর তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ যে পিচকারীর ভিতরে একটি দণ্ডের মাথায় কতকটা কাপড় বা চামড়া লাগান থাকে। ঐ কাপড় বা চামড়া পিচকারীর ভিতর দিকের গায়ে চারিদিকে এমনভাবে লাগিয়া থাকে যে তাহার পাশ দিয়া সহজে বায়ু চলাচল করিতে পারে না। পিচকারীর দণ্ডের মাথাটি নীচের দিকে শেষ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া উহার সরু নলটি জলের ভিতর ডুবাইয়া দণ্ডটি উপরের দিকে টানিলেই দণ্ডের মাথার নীচে খানিকটা জায়গা একেবারে খালি হইয়া যায়, বাতাস পর্য্যন্ত যাইতে পারে না। আর জায়গা খালি হইলেই নীচের জল উঠিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ভরিয়া যায়। পাম্পের ভিতরে জল ঠিক এইরূপ ভাবেই উপরে উঠে; কিন্তু ইহার কারণ কি? নীচে হইতে জল পিচকারীর মধ্যে কে ঠেলিয়া উঠাইল? অতি প্রাচীন

কাল হইতে সকলের—এমন কি জ্ঞানী লোকদিকের—ভিতরেও এই দৃঢ় বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছিল যে, প্রকৃতি দেবী শূন্য স্থানকে বড়ই ঘৃণা করেন, এবং সেজন্য কোন জায়গা খালি থাকিতেই পারে না। কোন জায়গা হইতে যদি বাতাস বাহির করিয়া লওয়া হয় তবে তাহা অন্য জিনিষ দিয়া ভরিয়া যাইবে। এই জন্য পিচকারী বা পাম্পের ভিতরকার দণ্ড উপরদিকে টানিয়া লইলে দণ্ডের মাথার নীচের খালি জায়গাটি দখল করিতে নলের ভিতর দিয়া জল উপরে উঠিয়া আসে। ইহাই ছিল তখনকার লোকের বিশ্বাস। গেলিলিও রাজবাড়ীর পাম্প্‌টি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, নলের ভিতর তেত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে, এবং উপরের সাত ফুট একেবারে খালি; হাওয়া বা জল কিছুই নাই। ইহার কারণ কি? প্রকৃতি দেবী যদি শূন্যস্থান পছন্দ না করেন, তবে তেত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত শূন্যস্থান পছন্দ করেন না, কিন্তু তাহার উপরের জায়গা শূন্য রাখিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, ইহা কিরূপ কথা। তিনি বিষম ধাঁধায় পড়িলেন এবং সে ধাঁধার উত্তর বাহির করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। পরে ঐ ধাঁধার উত্তর বাহির করিতে লাগিয়া গেলেন তাঁহার প্রিয় শিষ্য টরিসেলি (Torricelli)। তেত্রিশ ফুটের উপরে আর কেন জল উঠিতেছে না, ইহার কারণ বাহির করিতে তিনি নানা

পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং তাহার ফলে কিরূপে বায়ু-মণ্ডলের চাপ মাপিবার উপায় বাহির করিলেন তাহা শুন। তিনি জলের পরিবর্ত্তে পারা (mercury) ব্যবহার করিয়া দেখিলেন যে পারা বায়ুশূন্য নলের ভিতর কেবলমাত্র দুই ফুটের সামান্য উপরে উঠিতে পারে। টরিসেলি এইরূপই আশা করিয়াছিলেন ; কারণ পারা জল অপেক্ষা প্রায় ১৪ গুণ বেশী ভারী। সুতরাং জল যদি ৩৩ ফুট উঠিতে পারে, তবে পারা ১৪ গুণ ভারী বলিয়া ৩৩ ফুটের ১৪ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ ২ ফুটের কিছু বেশী উঠিবে।

শেষে অন্য প্রকারে এই সত্য আরও ভাল করিয়া প্রমাণিত হইল। টরিসেলির উপদেশ অনুসারে তাঁহার এক ছাত্র পরীক্ষাটি করিলেন। তিন ফুট লম্বা ও এক মুখ বন্ধ একটি কাচের নল লইয়া তাহা পারা দিয়া একেবারে ভরিয়া নলের খোলা মুখটি হাতের আঙ্গুল দিয়া বন্ধ করিলেন। পরে নলটি ধীরে ধীরে উল্টাইয়া পারা ভরা অপর একটি পাত্রের ভিতর আঙ্গুল সমেত নলের মুখটি ডুবাইয়া নলটিকে সোজা করিয়া রাখিয়া আঙ্গুলটি সরাইয়া লইলে দেখা গেল যে কতকটা পারা নলের ভিতর হইতে পাত্রের ভিতর চলিয়া আসিল ও নলের ভিতর খানিকটা পারা খাড়া হইয়া থাকিল (১নং চিত্র দেখ)। মাপিয়া দেখা গেল যে, পাত্রের পারার উপর হইতে নলের ভিতর যতটা পারা খাড়া হইয়া আছে তাহার দৈর্ঘ্য

৩০ ইঞ্চি, এবং তাহার উপরের ৬ ইঞ্চি জায়গা একেবারে খালি, বাতাস পর্য্যন্ত নাই। নলের ভিতর হইতে খানিকটা পারা বাহির হইয়া আসিল ও ৩০ ইঞ্চি লম্বা পারার স্তম্ভ খাড়া হইয়া থাকিল, ইহার কারণ কি ?
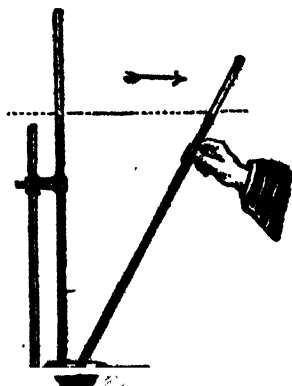
১নং চিত্র।
টরিসেলির পরীক্ষা।
কাচনলের ভিতর খানিকটা পারা খাড়া হইয়া থাকিল, নীচের পাত্রে পড়িয়া গেল না।

টরিসেলি পূর্ব্বেই জানিতেন যে, বাতাস হাজারই হাল্‌কা হৌক তাহারও ওজন আছে। গেলিলিও প্রথমে একটা খালি বোতলের ওজন লইয়া ও পরে বোতলটি গরম করিয়া তাহার ভিতর হইতে কতকটা বাতাস বাহির করিয়া দিয়া বোতলের ওজন লইয়া দেখিয়াছিলেন যে, পরের ওজন পূর্ব্বের ওজন অপেক্ষা কম, অর্থাৎ কতকটা বাতাস বাহির হইয়া যাওয়াতে বোতলের ওজন কমিয়া গিয়াছে। টরিসেলি ইহা জানিতেন ; সেজন্য তিনি বলিলেন যে, বাহিরের বাতাস পাত্রের পারার উপর চাপ দেওয়াতে ঐ চাপ নলের ভিতরের ৩০ ইঞ্চি লম্বা পারার স্তম্ভকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। ইহা কিরূপে হয় তাহা তোমরা নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে

পারা। ইংরাজী U অক্ষরের মত বাঁকা একটি কাচের নল লইয়া উহার এক মুখ দিয়া পারা ও অপর মুখ দিয়া জল ঢালিলে দেখিবে যে জলের স্তম্ভের দৈর্ঘ্য পারার স্তম্ভের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক বেশী। পারা জল অপেক্ষা প্রায় ১৪ গুণ ভারী বলিয়া এক ফুট লম্বা পারার স্তম্ভকে খাড়া রাখিতে প্রায় ১৪ ফুট লম্বা জলের স্তম্ভের দরকার হয়। সেইরূপ একশত মাইল লম্বা ও Uএর মত বাঁকা আর একটি নল লইলে উঁচুতে তাহা বায়ুমণ্ডলের প্রায় শেষ স্তরে পৌঁছিবে; অর্থাৎ উপরে যতদূর পর্য্যন্ত বাতাস আছে প্রায় ততদূর পৌঁছিবে; এখন যদি ঐ নলটির একদিকে শুধু বাতাস ভরা থাকে, এবং অপর দিক হইতে সমস্ত বাতাস তাড়াইয়া তাহার ভিতর পারা দেওয়া যায় তবে দেখিবে একশত মাইল লম্বা বাতাসের স্তম্ভ কেবলমাত্র ৩০ ইঞ্চি লম্বা পারার স্তম্ভকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে; অর্থাৎ একশত মাইল লম্বা বাতাসের চাপ বা সমস্ত বায়ুমণ্ডলের চাপ ৩০ ইঞ্চি লম্বা পারার চাপের সমান।

টরিসেলি তাঁহার কাচের নলের ভিতরের পারার স্তম্ভের দৈর্ঘ্যের প্রতি কিছু দিন লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে তাহা সব দিন সমান থাকে না, সামান্য কম বেশী হয়। ইহার কারণ টরিসেলি বলিলেন যে বায়ুমণ্ডলের চাপের ইতর বিশেষের জন্য পারার স্তম্ভের দৈর্ঘ্য কম বেশী হইতেছে; সুতরাং এইরূপে তিনি বাতাসের চাপ মাপিবার উপায়

বাহির করিলেন—আর প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতেই ব্যারো-মিটার (Barometer) বা বায়ু-চাপমান যন্ত্রের আবিষ্কার হইল।

এখানে একটি কথা তোমাদের বলিয়া রাখি। বাতাসের বা জল প্রভৃতি তরল পদার্থের চাপ ও তাহার ওজন ঠিক এক জিনিষ নয়। ৩০ ইঞ্চি লম্বা পারার স্তম্ভের বা এক মাইল লম্বা বাতাসের ওজন নির্ভর করিবে সেই স্তম্ভটি কত মোটা তাহার উপর, কিন্তু ঐ স্তম্ভের চাপ নির্ভর করিবে শুধু তাহার দৈর্ঘ্যের উপর—অর্থাৎ উপরে Uএর মত বাঁকা নল লইয়া যে পরীক্ষাটির কথা বলিলাম, নলটি সরু বা মোটা হইলে উহাতে পারার বা বাতাসের স্তম্ভের দৈর্ঘ্যের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, কারণ চাপ ঠিক থাকিলে দৈর্ঘ্যও ঠিক থাকিবে। যদি নলটি এক ইঞ্চি মোটা হয় তবে এক ইঞ্চি মোটা ও ৩০ ইঞ্চি লম্বা পারার ওজন এক ইঞ্চি মোটা ও পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে উপরে যতদূর পর্য্যন্ত বাতাস আছে ততটা লম্বা বাতাসের ওজনের সমান। আবার যদি এক ফুট মোটা নল লওয়া যায় তবে তাহার ভিতরেরও পারা ৩০ ইঞ্চি খাড়া হইয়া দাঁড়াইবে, কারণ ঐ পারার ওজন এক ফুট মোটা ও পূর্ব্বের ন্যায় লম্বা বায়ুর স্তম্ভের ওজনের সমান। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রতি বর্গ ইঞ্চির উপর প্রায় সাড়ে সাত সের আর প্রতি বর্গ ফুটে প্রায় সাড়ে সাতাশ মন।

সোজাসুজি ভাবে কিরূপে বায়ু-চাপমান যন্ত্র তৈরী করা যায় তাহা বোধ হয় শিখিতে পারিয়াছ। আন্দাজ তিন ফুট লম্বা ও এক মুখ বন্ধ একটি কাচের নল পারায় ভর্ত্তি করিয়া আঙ্গুল দিয়া অপর মুখটি বন্ধ করিয়া পারা ভরা অপর একটি পাত্রের ভিতর নলটি উপুড় করিয়া সোজা করিয়া রাখিয়া আঙ্গুল সরাইয়া লইলে মোটামুটি একটি বায়ুচাপমান যন্ত্র তৈরী হইবে (১নং চিত্র দেখ)। পাত্রের পারার উপর হইতে নলের ভিতরের পারার মাথা পর্য্যন্ত যতটা লম্বা সেই দৈর্ঘ্যের পারার চাপ দিয়া বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপা হয়।

যাহা হোক, সেই সময়ে টরিসেলির কথা কেহই বিশ্বাস করিতে রাজী হইলেন না। বাতাসের চাপে যে নলের ভিতরের পারা খাড়া হইয়া আছে, এবং ঐ পারার স্তম্ভের মাথার উপরের জায়গা যে একেবারে শূন্য একথা কেহই বিশ্বাস করিলেন না, কারণ প্রকৃতি দেবী যখন শূন্যস্থান পছন্দ করেন না তখন টরিসেলির কথা কিরূপে সত্য হইতে পারে!

সকলের ভুল দূর করিতে বিশেষ কোন চেষ্টা না করিয়া টরিসেলি তাঁহার পরীক্ষার ফল কেবল মাত্র রোমের একজন বন্ধুকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন; কিন্তু ক্রমে এই সংবাদ প্যারিসে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কাণে পৌঁছিল। তাঁহার নাম প্যাসকাল (Pascal)। তিনিও প্রথমে টরিসেলির পরীক্ষার ফল বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, যদি সত্যই বায়ুমণ্ডলের চাপ নলের

ভিতরের পারাকে খাড়া করিয়া রাখিয়া থাকে তবে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে যতই উপরে উঠা যাইবে নলমধ্যস্থ পারার দৈর্ঘ্য নিশ্চয়ই ততই কমিয়া যাইবে।”

১৬৪৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্যাসকাল্ সকলের সমক্ষে এই বিষয়ের সত্যতা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। সকলকে Puy-de-Dome নামে ফ্রান্সের একটি উঁচু পাহাড়ের নিকট লইয়া গেলেন ও টরিসেলির ন্যায় দু’টি পারা ভরা কাচের নল লইয়া একটি পাহাড়ের তলদেশে ও অপরটি উঁচু চূড়ায় রাখিয়া দেখিলেন যে উপরের নলটিতে পারার স্তম্ভের দৈর্ঘ্য নীচের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ৩ ইঞ্চি কম। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এবং বাতাসের চাপই যে নল-মধ্যস্থ পারাকে খাড়া করিয়া রাখে একথা বিশ্বাস করা ছাড়া তখন আর কোন উপায় রহিল না।

প্যাসকাল্ অন্য একটি পরীক্ষার দ্বারা এ সন্দেহ একেবারে দূর করিলেন। একটি রবারের বেলুনের ভিতর সামান্য খানিকটা হাওয়া ভরিয়া বেলুনটি লইয়া পাহাড়ের উপরে উঠিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন উপরে উঠিতে উঠিতে বেলুনটির পেট ক্রমে ফুলিয়া উঠিল, আবার নীচে নামিবার সময় দেখিলেন যে পেট ক্রমে কমিয়া বেলুনটি শেষে পূর্ব্বের অবস্থায় দাঁড়াইল। ইহার অর্থ এই যে উপরে উঠিবার সময় বেলুনের উপর বাহিরের বায়ুর চাপ ক্রমে যতই কমিতেছিল বেলুনের ভিতরের বায়ুর আয়তন ততই

বাড়িয়া উঠিতেছিল। আবার নীচে নামিবার সময় বাহিরের বায়ুর চাপ যতই বাড়িতেছিল, বেলুনের ভিতরের বায়ু আয়তনে ততই সঙ্কুচিত হইতেছিল।

তোমাদের মনে আছে বোধ হয় টাস্কানীর অধিপতির সেই কূয়ো খোঁড়ার কথা। এতদিনের পর বুঝা গেল কেন শত চেষ্টা করিয়াও পাম্পের দ্বারা ৩৩ ফুটের বেশী জল উঠাইতে পারা যায় নাই। ইহার কারণ ঐ দৈর্ঘ্যের জলস্তম্ভের চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান। কূয়োর পাম্পটি ৪০ ফুট উপরে থাকায় উহার নলের ভিতর ৩৩ ফুট জলে ভরা ছিল ও তাহার উপরের ৭ ফুট খালি ছিল।

১৬২৫ সালে গেলিলিও যে সমস্যা দূর করিবার চেষ্টা স্থুরু করিয়াছিলেন এতদিনে ১৬৪৮ সালে তাহা শেষ হইল, ও ইহার ফলে বায়ুচাপমান যন্ত্রের (Barometer) সৃষ্টি হইল। এই যন্ত্র আজকাল একটি বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিষ। ইহা দ্বারা বায়ুমণ্ডলের চাপের হ্রাস বৃদ্ধি দেখিয়া আব্‌হাওয়ার গতি কিরূপ হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই বলা যায়। যদি উহার ভিতরের পারা ধীরে ধীরে নিয়মিত রূপে উঠানামা করে তবে আকাশের অবস্থা ভাল থাকিবে এইরূপ বুঝা যায়, আর পারার স্তম্ভ যদি হঠাৎ খানিকটা নামিয়া যায় তবে শীঘ্র ঝড় হইবে ইহাই নির্দ্দেশ করে। এজন্য প্রত্যেক জাহাজে একটি বায়ুচাপমান যন্ত্র থাকাই চাই।

এই সব কাজের জন্য সাধারণতঃ আর একপ্রকার চাপমান

যন্ত্র ব্যবহার হয় যাহাতে পারার দরকার হয় না। ইহার নাম "এ্যানিরয়েড্ ব্যারোমিটার" (Aneroid barometer)। ইহা দেখিতে অনেকটা গোল বড় ঘড়ির ন্যায় (২নং চিত্র দেখ)। ইহার সম্মুখে ঘড়ির কাঁটার ন্যায় দু'টি কাঁটা আছে, যাহার একটি বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্ত্তনের সহিত আপনি ঘুরিয়া আকাশের অবস্থা পরে কিরূপ হইবে তাহা কিছু পূর্ব্বেই দেখায় (২নং চিত্র দেখ)।

২নং চিত্র।
এ্যানিরয়েড্ ব্যারোমিটার।

ঐ কাঁটা যন্ত্রের ভিতরে একটি পাতলা বাক্সের সহিত লাগান থাকে। ঐ বাক্সের ভিতর হইতে বাতাস বাহির করিয়া লওয়া হয়। ঐ বাক্সটি এত পাতলা ও এরূপ ভাবে তৈরী যে বায়ুমণ্ডলের চাপের সামান্য পরিবর্ত্তনে উহার উপরের ডালা উঠানামা করে এবং উহার সংলগ্ন কাঁটাটিও ঘুরিয়া যায়।

—:০:—

বায়ুর চাপের খেলা

এইবার তোমাদের বায়ুর চাপের মজার খেলার কথা বলিব। এই সোজা পরীক্ষা দু'টি তোমরা নিজে করিয়া দেখিও এবং তোমাদের বন্ধুবান্ধবকে দেখাইয়া অবাক করিয়া দিও।

(১) একটি কাচের গেলাস কাণায় কাণায় জলে ভর্ত্তি কর। বাঁ-হাতে গেলাসটি ধর ও গেলাসের মুখ অপেক্ষা সামান্য বড় একখানি পুরু কাগজ লইয়া (এক খানি পোষ্ট-কার্ড হইলেই চলিবে) তোমার ডান হাতের তালু দিয়া কাগজ খানি গেলাসের মুখে ভাল করিয়া চাপিয়া ধর (১ (ক)নং চিত্র দেখ)। এইবার ধীরে ধীরে গেলাসটি উপুড় করিয়া দিয়া বাঁ-হাত দিয়া গেলাসটি ধরিয়া থাক ও ডান হাতটি সরাইয়া লও। দেখিবে যে গেলাসের জল একটুও পড়িবে না, কাগজ খানি জল আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে। গেলাস উপুড় করিলেও জল পড়িল না—কিরূপ আশ্চর্য্য বলত !

ইহা কিরূপে সম্ভব হইল শুন। কাগজ খানির উপর ভিতর দিক হইতে জলের চাপ পড়িতেছে ; তাহাতে জলশুদ্ধ কাগজখানি পড়িয়া যাইবার কথা, কিন্তু কাগজের বাহির দিক হইতে বায়ুর চাপ উহাকে উপরের দিকে ঠেলিয়া

রাখিয়াছে। বায়ুর চাপ জলের চাপ অপেক্ষা বেশী বলিয়াই জল পড়িতে পারিতেছে না। ৩৪ ফুট অথবা তাহার চেয়েও লম্বা গেলাস বা কাচের নল লইয়া যদি এরূপ পরীক্ষা করিতে পার তবে দেখিবে যে সেবার সব জল পড়িয়া যাইবে। ইহার কারণ এই যে বাহিরের বায়ুর চাপ ৩৪ ফুট লম্বা জল-স্তম্ভের চাপের সমান, সুতরাং ভিতরের চাপ ইহা অপেক্ষা সামান্য বেশী হইলেই বাহিরের বায়ুর চাপ উহাকে আর আট্কাইয়া রাখিতে পারিবে না।
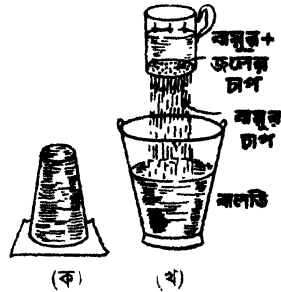
১নং চিত্র।

পরীক্ষা করিবার সময় যদি গেলাসটি কাণায় কাণায় জলে ভর্ত্তি না থাকে অর্থাৎ কাগজখানি দিবার সময় জল ও কাগজের ভিতরের জায়গায় বাতাস থাকিয়া যায় তবে গেলাস উপুড় করিলেই জল পড়িয়া যাইবে। সুতরাং তোমরা প্রথম বারে সফল না হইলেও দুই তিনবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই সফল হইবে।

(২) ১ (খ) নং ছবিতে যেরূপ দেখিতেছ ঐরূপ তলায় ছোট ছোট ছিদ্র বিশিষ্ট একটি টিনের পাত্র তৈরী করাইয়া লইও। ঐরূপ পাত্রে জল ঢালিলে সব জল তলা দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। ঐরূপ একটি পাত্র লইয়া উহাকে

একটি জলে ভরা বালতির ভিতর ডুবাইয়া রাখ, এবং পাত্রটি জলে ভর্ত্তি হইয়া গেলে উহার মুখে একটি ছিপি (রবারের ছিপি হইলে ভাল হয়) জোর করিয়া আঁটিয়া দাও, অথবা হাতের তলা দিয়া পাত্রের মুখ জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া পাত্রটি বালতি হইতে বাহির করিয়া আন। দেখিবে যে তলায় অতগুলি ছিদ্র থাকা সত্ত্বেও একটুও জল পড়িতেছে না। এইবার মুখ হইতে হাতটি সরাইলে বা ছিপি খুলিয়া দিলে তলা দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে থাকিবে।

বায়ুমণ্ডলের চাপই ইহার কারণ। যখন ছিপি বন্ধ থাকে তখন শুধু জলের চাপ পাত্রের তলায় যে বায়ুর চাপ (উপরের দিকে) পড়িতেছে তাহা অপেক্ষা কম বলিয়া জল পড়িতেছে না; কিন্তু ছিপি খুলিয়া লইলে, উপর হইতে বায়ু ও জলের চাপ মিশিয়া নীচের শুধু বায়ুর চাপ অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া যায়, সেজন্য জল পড়ে।

তোমরা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছ যে একটি লম্বা সাধারণ কাচের নল জলের ভিতর ডুবাইয়া উপরের মুখ বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া উঠাইয়া লইলে বাহিরের বায়ুর চাপের জন্য নলের মধ্যে জল আটকাইয়া থাকে।

—:০:—